বাংলা ভাষা

শিখন ও শিক্ষণ

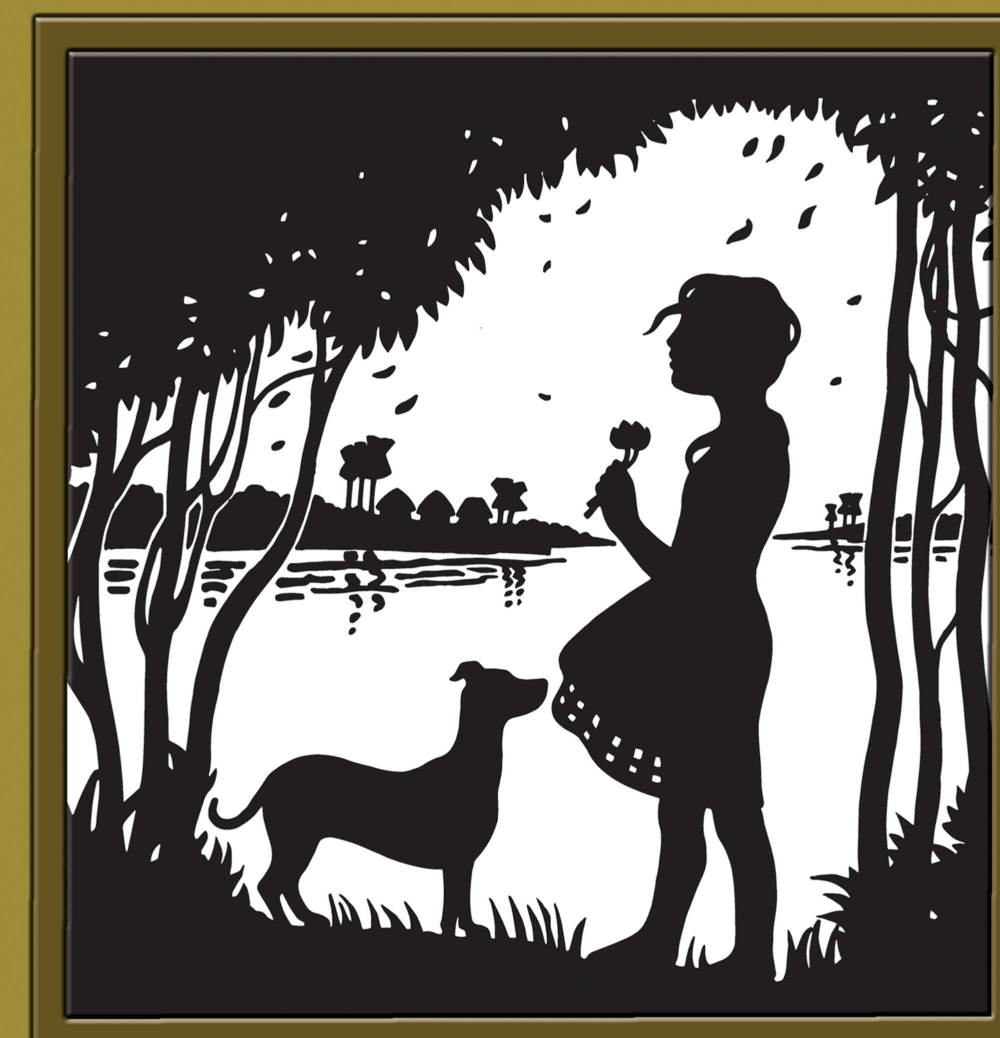

বাংলাভাষা শিখন ও শিক্ষণ

SCERT, WB

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

বাংলা ভাষা
শিখন ও শিক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

প্রকাশক :
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ

গ্রন্থস্বত্ব :
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-81-937413-0-6

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ **: জানুয়ারি, ২০২৩**

সম্পাদনা :
বৈশালী বসু (রায়চৌধুরী)
গভর্ণমেন্ট কলেজ অব এডুকেশন, বর্ধমান

সঞ্চালক :
ড. কে. এ. সাদাত ও নীলাঞ্জন বালা

প্রচ্ছদ : তমাল মোহান্ত

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০০৫) অনুসারে শিক্ষক শিক্ষণের ধারণাটি আধুনিক সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, নিয়ত পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। সমাজ পরিস্থিতি বদলেছে অনেক, দূরের পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠেছে একই ভুবনগ্রামের বাসিন্দা। বিশ্বায়িত পৃথিবীতে মানুষের সত্ত্বা যতো প্রসারিত হচ্ছে, ততো বাড়ছে তার আত্মপরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা। এই আত্মপরিচয় মানুষের গড়ে ওঠে তার ভাষা, তার মাতৃভূমি, তার ঐতিহ্যের যাপনের মধ্য দিয়ে। বাংলা ভাষা যেমন মানুষের মাতৃভাষা, তারা বহন করছে এক অবিস্মরণীয় উত্তরাধিকার। বাংলা ভাষায় স্বীকৃতির জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা পরিণতি পেয়েছিল একটি জাতির স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষার সংগ্রামে। ইউনেস্কো এই ভাষা আন্দোলনকে মর্যাদা দিয়ে ১৯৯৯ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রতীক ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এই উত্তরাধিকারকে যারা বহন করে নিয়ে যাবে, সেই নবীন প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি কখনো কখনো অনীহা দেখা যায়। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জাগ্রত করবেন, তাকে সন্ধান দেবেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যময় সম্ভারের। সেইজন্যই শিক্ষককেও বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞানের আহরণ, সংরক্ষণ ও সঞ্চালন করতে হবে।

বর্তমান ডি.এল.এড পাঠ্যক্রমে এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রথম ভাষা বাংলার পাঠ্যসূচি রচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে সাধারণ পরিচিতি; মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি; বাংলা ভাষা শিক্ষায় বিবিধ দক্ষতার বিকাশ; ব্যাকরণ সংক্রান্ত শিখন-শিক্ষণ; ভাষার আত্তীকরণের মতো তাত্ত্বিক এবং তথ্যগত বিষয় এই পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলি যেমন—অনুপাঠটীকা ও বৃহৎ পাঠটীকা প্রস্তুতি, অভীক্ষা নির্মাণ প্রভৃতিও এই পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে যাঁরা নিজেদের লেখনীতে ধরেছেন, তাঁরা হলেন ডঃ বিষ্ণুপদ বেরা, সাক্ষীগোপাল কুণ্ডু, অভিজিত নন্দী।

SCERT এই পাঠ্যক্রমটির সূক্ষ্ম রূপায়ণ ও প্রয়োগে যে প্রয়াস নিয়েছেন, আশাকরি ''বাংলা ভাষা শিখন ও শিক্ষণ'' বইটি সেই প্রয়াসের উপযুক্ত অংশীদার হয়ে উঠতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা যৌথ গবেষণাধর্মী কাজের ফসল এই পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন ডি.এল.এড পাঠক্রমে উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাববোধ থেকে এই ডিরেক্টরেট সরকারী নির্দেশনার 712-Edn(Cs) / 8t-17 / 79 তারিখ 21.05.1980 সেকশন (iii), (iv), (viii) ও (x) অনুসারে " Development of Teaching Clarity " নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।

প্রকল্পের শুরুতেই সামগ্রিক পাঠক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিতে কর্মশালা শুরু করা হয়েছিল। যেমন– (১) ব্যবহারিক বিষয়সমূহ (P-1, P-2, P-3, P-4) ও তার আদান-প্রদান কার্যবিধি–এই নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ই আগষ্ট, ২০১৫ থেকে ১৪ই আগষ্ঠ,২০১৫। (২) পাঠক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুসমূহ (Core Curriculum CC-01, CC-02, CC-03, CC-04, CC-05) নিয়ে একইভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, উত্তর চব্বিশ পরগনাতে ২৪ শে আগষ্ট ২০১৫

থেকে ২৮ শে আগষ্ট ২০১৫ পর্যন্ত। (৩) এরপর বিষয়জ্ঞান ও পাঠদান পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি CPS-1, CPS-2, CPS-3, CPS-4) নিয়ে কর্মশালা হয় ডায়েট, হাওড়াতে ৩১শে আগষ্ট, ২০১৫ থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

এই প্রতিটি কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মধ্যে থেকে যে কথাগুলি জোরালো ভাবে উঠে এসেছিল, তা হল– ''ডি.এল.এডের জন্য সঠিক শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী প্রয়োজন''।

এই প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই কোনরকম সময় নষ্ট না করে ডায়েট, বর্ধমানে ২০১৬-র জানুয়ারীর ২ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত শুরু হয়েছিল কাজ, যার নাম ছিল– " Instructional Material Design (Development of Teaching Clarity) for Teacher Preparation "–এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ডায়েট হুগলীতে। এরপর কাজগুলিকে নিয়ে পর্যালোচনা, সংযোজন, বিয়োজনের কাজ চলে দু-দফায়– ১০ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত ডায়েট, পুরুলিয়াতে ও ২১শে এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে।

এই দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে যে ফসল উৎপাদিত হল, তা আদৌ কতটা কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে শিক্ষক- শিক্ষণে তা যাচাই করে দেখা ভীষণ জরুরী ছিল। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে এই প্রকল্পের তথা রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে পাইলট টেস্টিং এর কার্যকরী কৃৎকৌশল নির্মানের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, হাওড়াতে ২রা মে ২০১৬ থেকে ৪ঠা মে ২০১৬ তারিখে। এরপর পাইলট টেস্টিং অংশ হিসেবে একমাস ধরে রাজ্যে চারটি ডায়েটে– কোচবিহার, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হাওড়ায় রাজ্যের প্রায় সকল ডায়েটে কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে এই শিখন সামগ্রী শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োগ করা হয়। এই পাইলট টেস্টিং সার্থকতার সঙ্গে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ হয় 'State Monitoring Team' দ্বারা।

সবশেষে পরীক্ষিত শিখন সামগ্রী বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর কাছে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয় ডায়েট, হুগলীর তত্ত্বাবধানে ৬ই ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ১০ই ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশনাকালে প্রকল্পের পক্ষ থেকে যাদের ঋণ স্বীকার করে নিতে হয়, তারা হলেন– শ্রী মিলন কুমার সাহা, অধ্যক্ষ, ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুর, ডঃ স্বপ্না ঘোষ, অধ্যক্ষা, ডায়েট, উত্তর ২৪ পরগণা, শ্রী তপন কুমার মল্লিক, অধ্যক্ষ, ডায়েট, বর্ধমান, ডঃ সন্ধ্যাদাস বসু, অধ্যক্ষা, ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং শ্রী পরিতোষ প্রামানিক, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ডায়েট, পুরুলিয়া।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়– অধ্যক্ষ, ডায়েট হুগলি ডঃ কে.এ.সাদাত ও অধ্যক্ষ, ডায়েট, হাওড়া, ডঃ বিশ্বরঞ্জন মান্নাকে– যারা শিখন সামগ্রী প্রনয়ণ ও পাইলট ট্রেনিং এর মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী নীলাঞ্জন বালা, রিসার্চ ফেলো, এস.সি.ই.আর.টি-কে –এই প্রকল্প শুরু থেকেই যার পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা ও ভাবনায় একটি পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বিকশিত হয়ে আজ সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছে।

ডঃ ছন্দা রায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম অধ্যায় :	প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ভিত্তিক ধারণা	১-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বাংলা ভাষা শিখন-শিক্ষণের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৭-২৩
তৃতীয় অধ্যায় :	বাংলা ভাষা শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রয়োগ	২৪-৩৪
চতুর্থ অধ্যায় :	বাংলা ভাষা শিখন-শিক্ষণে দক্ষতাবলীর বিকাশ	৩৫-৪৯
পঞ্চম অধ্যায় :	পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং পাঠটীকা প্রণয়ন	৫০-৭০
ষষ্ঠ অধ্যায় :	ব্যাকরণ শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি	৭১-৯৩
সপ্তম অধ্যায় :	লিখন দক্ষতার বিবিধ ক্ষেত্র	৯৪-১০২
অষ্টম অধ্যায় :	প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষা শিখন-শিক্ষণের বিভিন্ন প্রেক্ষিত	১০৩-১১০
নবম অধ্যায় :	ভাষার স্বরূপ	১১১-১১৫
দশম অধ্যায় :	মূল্যায়ন	১১৬-১২৭

অধ্যায়
১

প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ভিত্তিক ধারণা

১.১. সূচনা

পশ্চিমবঙ্গে নব প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের আনন্দময় শিখন (Joyful learning) পরিবেশকে বাস্তবায়িত করার জন্য স্তরভেদে বয়স, আগ্রহ ও সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে যে শিক্ষাসূচি নির্মাণ করা হয়েছে তা একান্তভাবে যুগোপযোগী। সময়োচিত এই ব্যবস্থাপনায় আমরা আশাবাদী যে শিক্ষাক্ষেত্রে অপব্যয় এবং স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমানো যাবে। শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিকস্তর বিবেচনা করে ‘থিম’ ভিত্তিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯)-কে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক রচিত প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যসূচি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল —

১.২. উদ্দেশ্য ঃ

- প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের ভাষা ও সাহিত্য পাঠ পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- সমাজের বিভিন্ন শিশুদের ভাষা শিক্ষা সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তার সমাধানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা
- শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান আরও প্রসারিত করা।
- রুচিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠনে সহায়তা করা।
- মাতৃভাষার বিশেষ গঠন, ব্যাকরণের মূলনীতি ও বাগবিধির সঙ্গে ক্রমান্বয়ে পরিচয় করানো।

১.৩. প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যসূচির তালিকা ঃ

প্রথম শ্রেণি (আমার বই)

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	অনুসারী পাঠ/ভিত্তি পাঠ
মুনিরাম মুন্‌সি (কবিতা)	৩৬		
আমি দেখি কত রং (কবিতা)	১৩০		
এই দেখো বন (গদ্য)	১৪৫		বনে থাকে বাঘ
ভোরের পাঠ (গদ্য)	১৫১		আলো হয় গেল ভয়
ঝড় এল (গদ্য)	১৫৭		
কাঁচা আম (কবিতা)	১৭০	সুখলতা রাও	
বোয়াল মাছের হাঁ (কবিতা)	১৮১		
দাদা বাজারে গেছেন (গদ্য)	১৮৬		ঐ সাদা ছাতা
পরিবার (কবিতা)	১৯২		
আমাদের চারপাশ (গদ্য)	২০১		নাম তার মোতিঝিল
শিল পড়ে টুপটাপ (কবিতা)	২০৬		
সকাল বিকেল (গদ্য)	২০৮		বিনি পিসি
চলে হন্‌হন্ (কবিতা)	২১৩	সুকুমার রায়	বিনি পিসি
কোকিল এল ময়নার কাছে (গদ্য)	২১৮		বিনি পিসি

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	অনুসারী পাঠ/ভিত্তি পাঠ
আমাদের ময়না (কবিতা)	২২২	কার্তিক ঘোষ	
পথে লোক চলে	২২৫		ছায়ার ঘোমটা
পাখিরা (কবিতা)	২৩১	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	
ডাঙাতেও চলি আমি (কবিতা)	২৩৫		
বেশির ভাগ মানুষ একটা সময় (গদ্য)	২৪২		
রোদ পড়ে জল গরম হয়ে (কবিতা)	২৪৬		
এই দেখো গাছ (গদ্য)	২৫৩		কাল ছিল ডাল খানি
মানুষের ঘর-বাড়ি (গদ্য)	২৬০		ভোর হল। ধোপা আসে
বনেবাদাড়ে (কবিতা)	২৬৩	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	
গাছে আছে মৌচাক (গদ্য)	২৬৭		এসো, এসো, গৌর এসো
শিউলিফুল শিউলিফুল (গদ্য)	২৭৮		এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
ছুটির মজা (গদ্য)	২৮১		এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
শরতের শেষে হিম পড়ে (গদ্য)	২৮৪		চুপ করে বসে ঘুম পায়
ফুল ছিল সে .... (কবিতা)	২৯৪	ভবানীপ্রসাদ মজুমদার	কতদিন ভাবে ফুল
এখন ভোরবেলা (গদ্য)	৩০১		
ছোটো রবি, ছোটোদের রবি (গদ্য)	৩০৭		
নুরু থেকে নজরুল (গদ্য)	৩১৪		
পশুর দেশে (নাটক)	৩১৮		
নীল ময়ূরের পালক (গদ্য)	৩৪১		কতদিন ভাবে ফুল

দ্বিতীয় শ্রেণি (আমার বই)

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
বনের পথে (গদ্য)	৩		
ঘুড়ি ওড়াবার দিনে (গদ্য)	৪		
আকাশে কত তারা (গদ্য)	৫		
খেলার মাঠে (গদ্য)	৬		
নাও চলেছে (গদ্য)	৭		
মা বিড়াল আর ছানা বিড়াল (গদ্য)	৮		
মেলার মাঠে (গদ্য)	৯		
ঘাসের নকশা (গদ্য)	১০		
হাসির নাটক (গদ্য)	১১		
বাজনার তালে তালে (গদ্য)	১২		

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
গুপির বিপদ (গদ্য)	১৩		
হাওয়ায় ছুটি (গদ্য)	১৪		
ভোরের আকাশে (গদ্য)	১৬		
ঝুরি নামে মাটিতে (গদ্য)	১৭		
হাটে বাজারে (গদ্য)	১৮		
পাহাড়ের হাতছানি (গদ্য)	১৯		
অজানা ইতিহাস (গদ্য)	২০		
মজার চিড়িয়াখানা (গদ্য)	২১		
মেঘের ঘনঘটা (গদ্য)	২২		
জল থইথই (গদ্য)	২৩		
নাইতে নামি (গদ্য)	২৪		
বিকেলের নানা রং (গদ্য)	২৫		
আলো আমার, আলো ওগো (সংগীত)	৩৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
প্রভাত বর্ণন (কবিতা)	৩৪	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	
জনগণমন (সংগীত)	৬৭	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বর্ষার দিনে (কবিতা)	৬৯	অন্নদাশংকর রায়	
বাদল দিনে (গল্প)	৭৩	পুণ্যলতা চক্রবর্তী	
বারোমেসে (কবিতা)	৮৫	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	
আগুনের পরশমণি (সংগীত)	৯৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
উচিত শিক্ষা (উপকথা)	১০৮		
অতিথ্ পাখি (কবিতা)	১২০	সরল দে	
বেলুন বাড়ি (কবিতা)	১২৬	শঙ্খ ঘোষ	
আমাদের গ্রাম (কবিতা)	১৩৭	বন্দে আলি মিঞা	
বুদ্ধির পরীক্ষা (গল্প)	১৪৮	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	
পরোপকার (কবিতা)	১৫৩	রজনীকান্ত সেন	
গাছে গাছে (কবিতা)	১৫৯	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	
আমার বাড়ির কাছে (কবিতা)	১৬৬	বিনয় মজুমদার	
ও রোদ্দুর (কবিতা)	১৭২	নির্মলেন্দু গৌতম	
বিদ্যাসাগরের কথা (গদ্য)	১৭৯		
হাতির মা (গল্প)	১৮৭	লীলা মজুমদার	
শব্দকল্পদ্রুম (কবিতা)	১৯৩	সুকুমার রায়	
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ (গদ্য)	১৯৯		

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/ লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
মেঘের মুলুক (গদ্য)	২০৪	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	
ফলসা বনে গাছে গাছে (কবিতা)	২১৯		
মিলি (কবিতা)	২২৯	পূর্ণেন্দু পত্রী	
ছুটি (কবিতা)	২৩৭	রহীম শাহ	
প্রজাপতি ! প্রজাপতি (সংগীত)	২৬৪	কাজী নজরুল ইসলাম	
প্রথম পুরস্কার (নাটক)	২৬৫	স্বপন বুড়ো	

তৃতীয় শ্রেণি (পাতাবাহার)

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/ লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
সত্যি সোনা (প্রচলিত গল্প)	১		
আমরা চাষ করি আনন্দে (কবিতা)	৯	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
নিজের হাতে নিজের কাজ (গল্প)	১৩		
দেয়ালের ছবি (প্রচলিত গল্প)	১৮		
সারাদিন (কবিতা)	২৩	সুনির্মল চক্রবর্তী	
ফুল (প্রবন্ধ)	২৭	সুখলতা রাও	
আজ ধানের ক্ষেতে (সংগীত)	৩২	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
সোনা (গল্প)	৩৪	গৌরী ধর্মপাল	
নদী (কবিতা)	৪১	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	
নদীর তীরে একা (প্রবন্ধ)	৪৩	জীবন সর্দার	
		সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	
নৌকাযাত্রা (কবিতা)	৫০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ঢেউয়ের তালে তালে (ভ্রমণ কাহিনী)	৫৫	পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	আন্দামান অভিযান
পর্যটন (কবিতা)	৬০	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	
গাছেরা কেন চলাফেরা করে না (গদ্য)	৬২	প্রচলিত কথা	
গাছ বসাব (কবিতা)	৬৯	কার্তিক ঘোষ	
জুঁই ফুলের রুমাল (গল্প)	৭০	কার্তিক ঘোষ	জুঁইফুলের রুমাল
সাথি (গদ্য)	৭৭	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
একা একা থাকতে নেই (গল্প)	৮২	প্রচলিত গল্প	
আরাম (কবিতা)	৮৭	শঙ্খ ঘোষ	
হিংসুটি (সংগীত)	৯০	সুকুমার রায়	
মনকেমনের গল্প (সংগীত)	৯৬	নবনীতা দেবসেন	

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
দেশের মাটি (কবিতা)	১০০	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	
কীসের থেকে কী যে হয়	১০৪	প্রচলিত গল্প	
আগমনী (কবিতা)	১১১	প্রেমেন্দ্র মিত্র	
উড়ুক্কু ভূত (সংগীত)	১১৪	শৈলেন ঘোষ	
মা ও ছেলে (কবিতা)	১১৭	রসময় লাহা	
কে ছিলেন ইশপ (জীবনী)	১১৮		
পান্‌তা বুড়ি (সংগীত)	১২৩	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	
ঘুমিয়ো নাকো আর (কবিতা)	১২৮	বিমলচন্দ্র ঘোষ	
ভাষাপাঠ (গদ্য)	১৩৪		
ভাষার কথা (গদ্য)	১৩৪		
বাক্যের কথা (গদ্য)	১৩৭		
বর্ণ আর ধ্বনির কথা (গদ্য)	১৪২		
নিয়মের কথা (গদ্য)	১৪৬		

চতুর্থ শ্রেণি (পাতাবাহার)

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
সবার আমি ছাত্র (কবিতা)	১	সুনির্মল বসু	
নরহরি দাস (সংগীত)	৪	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	
কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার (সংগীত)	১৪	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
তোত্তা-চানের অ্যাডভেঞ্চার (গদ্য)	১৫	তেৎসুকো কুরোয়ানাগি অনুবাদক : মৌসুমী ভৌমিক	তোতো-চান
বনভোজন (কবিতা)	২৩	গোলাম মোস্তাফা	
ছেলেবেলার দিনগুলি (স্মৃতিকথা)	২৮	পুণ্যলতা চক্রবর্তী	
মালগাড়ি (কবিতা)	৩৬	প্রেমেন্দ্র মিত্র	
বনের খবর (শিকার কথা)	৪০	প্রমদারঞ্জন রায়	বনের খবর
দু-চাকায় দুনিয়া (ভ্রমণ)	৪৭	বিমল মুখার্জি	দু’চাকায় দুনিয়া
বিচিত্র সাধ (কবিতা)	৫০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শিশু
আমাজনের জঙ্গলে (অ্যাডভেঞ্চার) (গদ্য)	৫৬	অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	আমাজনের জঙ্গলে
সত্যি চাওয়া (কবিতা)	৬৩	নরেশ গুহ	
আমি সাগর পাড়ি দেবো (কবিতা)	৬৪	কাজী নজরুল ইসলাম	

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
দক্ষিণ মেরু অভিযান (অ্যাডভেঞ্চার)	৭০	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	নতুন যুগের মানুষ
বহু দিন ধরে (কবিতা)	৭৭	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
আলো (নাটক)	৭৮	লীলা মজুমদার	
বর্ষার প্রার্থনা (কবিতা)	৮৯	প্রচলিত লোকগান	
অ্যাডভেঞ্চার : বর্ষায় (গল্প)	৯০	মণীন্দ্র গুপ্ত	
ছবির ধাঁধা	৯৯	সুবিনয় রায়চৌধুরী	
খরবায়ু বয় বেগে (কবিতা)	১০৪	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
আমার মা-র বাপের বাড়ি (আত্মকথা)	১০৬	রাণী চন্দ	আমার মা-র বাপের বাড়ি
নদীপথে (ভ্রমণ)	১১৮	অতুলচন্দ্র গুপ্ত	নদীপথে
দূরের পাল্লা (কবিতা)	১২০	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	বিদায় আরতি
বাঘা যতীন (জীবনকথা)	১২৩	পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
আদর্শ ছেলে (কবিতা)	১৩১	কুসুমকুমারী দাশ	
উঠো গো ভারতলক্ষ্মী (সংগীত)	১৩৫	অতুলপ্রসাদ সেন	
যতীনের জুতো (গল্প)	১৩৬	সুকুমার রায়	
হেঁয়ালি নাট্য (গদ্য)	১৪৫	সুকুমার রায়	
নইলে (কবিতা)	১৪৭	অজিত দত্ত	
ঘুম পাড়ানি ছড়া (কবিতা)	১৫০	স্বপনবুড়ো	
মায়াদ্বীপ (গল্প)	১৫২	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	বড়োরা যখন ছোটো ছিল
ঘুম-ভাঙানি (কবিতা)	১৬২	মোহিতলাল মজুমদার	

পঞ্চম শ্রেণি (পাতাবাহার)

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
গল্পবুড়ো (কবিতা)	১	সুনির্মল বসু	সুনির্মল বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা
বুনো হাঁস (গল্প)	৬	লীলা মজুমদার	গল্পসল্প
দারোগাবাবু এবং হাবু (কবিতা)	১১	ভবানীপ্রসাদ মজুমদার	
খোকার বুদ্ধি (কবিতা)	১৫		
এতোয়া মুন্ডার কাহিনি (গদ্য)	১৬	মহাশ্বেতা দেবী	এতোয়া মুন্ডার যুদ্ধজয় (১ম পরিচ্ছদ)
পাখির কাছে ফুলের কাছে (কবিতা)	২৬	আল মাহমুদ	পাখির কাছে ফুলের কাছে
ওরে গৃহবাসী (সংগীত)	২৯	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/ লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
বিমলার অভিমান (কবিতা)	৩০	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	
ছেলেবেলা (আত্মকথা)	৩৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ছেলেবেলা
মাঠ মানে ছুট (কবিতা)	৪০	কার্তিক ঘোষ	
পাহাড়িয়া বর্ষার সুরে (প্রবন্ধ)	৪৪	সুনীল পাল	পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা / জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা
লিমেরিক (কবিতা)	৪৯	এডোয়ার্ড লিয়ার / তরজমা — সত্যজিৎ রায়	
ঝড় (কবিতা)	৫২	মৈত্রেয়ী দেবী	
মধু আনতে বাঘের মুখে (অ্যাডভেঞ্চার)	৫৭	শিবশঙ্কর মিত্র	সুন্দরবন সমগ্র
মায়াতরু (কবিতা)	৬৪	অশোকবিজয় রাহা	ভানুমতীর মাঠ
ময়দানব (কবিতা)	৬৮	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	
ফণীমনসা ও বনের পরি (নাটক)	৬৯	বীরু চট্টোপাধ্যায়	‘শিশুসাথী’ বৈশাখ ১৩৭১
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর (কবিতা)	৮০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বাদল-বাউল (সংগীত)	৮৪		
বোকা কুমিরের কথা (গল্প)	৮৫	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	টুনটুনির বই
চল্ চল্ চল্ (সংগীত)	৯০	কাজী নজরুল ইসলাম	
মাস্টারদা (গদ্য)	৯১	অশোককুমার মুখোপাধ্যায়	সূর্য সেন
মুক্তির মন্দির সোপান তলে (সংগীত)	৯৮	মোহিনী চৌধুরী	
মিষ্টি (কবিতা)	৯৯	প্রেমেন্দ্র মিত্র	
তালনবমী (গল্প)	১০২	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	গল্পগ্রন্থ - ‘তাল নবমী’
শরৎ তোমার (কবিতা)	১১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
একলা (কবিতা)	১১৪	শঙ্খ ঘোষ	কাব্যগ্রন্থ - ‘আমায় তুমি সাক্ষী বলো’
আকাশের দুই বন্ধু (সংগীত)	১১৯	শৈলেন ঘোষ	‘স্বপ্ন দেখি রূপকথায়’
পাখি নয়, ঘুড়ি ! (প্রবন্ধ)	১২৬		
বোম্বাগড়ের রাজা (কবিতা)	১২৭	সুকুমার রায়	‘আবোল তাবোল’
বই পড়ার কায়দাকানুন (প্রবন্ধ)	১৩০		

ষষ্ঠ শ্রেণি / (সাহিত্য মেলা)

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
ভরদুপুরে (কবিতা)	১	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	
সেনাপতি শংকর (গল্প)	৫	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	সেনাপতি শংকর
খোলামেলা দিনগুলি (স্মৃতিকথা)	১৪	শান্তিসুধা ঘোষ	
পাইন দাঁড়িয়ে আকাশে নয়ন তুলি (কবিতা)	১৬	হাইনরিখ হাইনে / তরজমা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
আকাশভরা সূর্য-তারা (সংগীত)	১৯	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
মন-ভালো-করা (কবিতা)	২০	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	
মেনি (কবিতা)	২২	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	
পশুপাখির ভাষা (প্রবন্ধ)	২৩	সুবিনয় রায়চৌধুরী	সুবিনয় রায়চৌধুরী রচনা সংগ্রহ
ঘাসফড়িং (কবিতা)	২৮	অরুণ মিত্র	
কুমোরে-পোকার বাসাবাড়ি	৩১	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	
আমার ময়ূর (গল্প)	৩৬	প্রিয়ম্বদা দেবী	প্রিয়ম্বদা দেবীর কিশোর রচনাসংগ্রহ
চিঠি (কবিতা)	৩৯	জসীমউদ্দিন	
মরশুমের দিনে (প্রবন্ধ)	৪২	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	নারদের ডায়েরি
খোজা খিজির উৎসব (প্রবন্ধ)	৫১	বিনয় ঘোষ	
হাট (কবিতা)	৫৩	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	
মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র (প্রবন্ধ)	৫৭	তপন কর	মাটির ঘরে দেয়াল চিত্র
ঝুমুর (কবিতা)	৬২	দুর্যোধন দাস	
পিঁপড়ে (কবিতা)	৬৩	অমিয় চক্রবর্তী	
ফাঁকি (সংগীত)		রাজকিশোর পট্টনায়ক বাংলা অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্র মোহন জোয়ারদার	
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা (কবিতা)	৭৬	বিমলচন্দ্র ঘোষ	
চিত্রগ্রীব (চিত্রকথা)		ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রচনাটিকে চিত্রকথায় রূপান্তরিত করেছেন	চিত্রগ্রীব (Gay neck)
আশীর্বাদ (সংগীত)	৯০	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	
এক ভূতুড়ে কাণ্ড (সংগীত)	৯৫	শিবরাম চক্রবর্তী	
বাঘ ! (কবিতা)	১০১	নবনীতা দেবসেন	
বঙ্গ আমার ! জননী আমার ! (সংগীত)	১০৫	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
শহিদ যতীন্দ্রনাথ দাশ (গদ্য)	১০৯	আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়	
চলরে চল সবে ভারত সন্তান (সংগীত)	১১৮	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ধরাতল (কবিতা)	১১৯	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চৈতালি
সেথায় যেতে যে চায় (কবিতা)	১২২	বন্দে আলী মিঞা	
হাবুর বিপদ (কবিতা)	১২৩	অজেয় রায়	
না পাহারার পরীক্ষা (প্রবন্ধ)	১৬৩	শঙ্খ ঘোষ	ছোট্ট একটা স্কুল
কিশোর বিজ্ঞানী (জীবনী)	১৩৬	অন্নদাশঙ্কর রায়	
ননীদা নট আউট (গল্প)	১৩৯	মতি নন্দী	ননীদা নট আউট
বইপড়ার কায়দাকানুন (২)	১৪৫		

সপ্তম শ্রেণি (সাহিত্যমেলা)

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
ছন্দে শুধু কান রাখো (কবিতা)	১	অজিত দত্ত	
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে (সংগীত)	৪	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
পাগলা গণেশ (কল্পবিজ্ঞান)	৫	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	
বঙ্গভূমির প্রতি (কবিতা)	১২	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	
মাতৃভাষা (কবিতা)	১৫	কেদারনাথ সিং / তরজমা মল্লিকা সেনগুপ্ত	
একুশের কবিতা (কবিতা)	১৬	আশরাফ সিদ্দিকী	
একুশের তাৎপর্য (প্রবন্ধ)	২১	আবুল ফজল	'একুশ মানে মাথা নত করা নয়'
নানান দেশে নানান ভাষা (কবিতা)	২২	রামনিধি গুপ্ত	
আত্মকথা (গদ্য)	২৩	রামকিঙ্কর বেইজ	
আঁকা, লেখা (কবিতা)	২৮	মৃদুল দাশগুপ্ত	
খোকনের প্রথম ছবি (গল্প)	৩৩	বনফুল	
কুতুব মিনারের কথা (প্রবন্ধ)	৩৭	সৈয়দ মুজতবা আলি	
আজি দখিন-দুয়ার খোলা (কবিতা)	৪১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
কার দৌড় কদ্দুর (গদ্য)	৪৩	শিবতোষ মুখোপাধ্যায়	
নোট বই (কবিতা)	৪৭	সুকুমার রায়	
মেঘ-চোর (গল্প)	৫০	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	
দুটি গানের জন্মকথা (প্রবন্ধ)	৬৩		
কাজী নজরুলের গান (গদ্য)	৬৭	রামকুমার চট্টোপাধ্যায়	'পুরাতনী'
আছেন কোথায় স্বর্গপুরে (সংগীত)	৬৯	লালন ফকির	লালন সমগ্র: আবুল আহসান

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
স্মৃতিচিহ্ন (কবিতা)	৭০	কমিনী রায়	চৌধুরী সংকলিত
চিরদিনের (কবিতা)	৭৩	সুকান্ত ভট্টাচার্য	'ঘুম নেই'
জাতের বজ্জাতি (কবিতা)	৭৮	কাজী নজরুল ইসলাম	
তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে (সংগীত)	৭৯	রজনীকান্ত সেন	
ভানুসিংহের পত্রাবলি (গদ্য)	৮০	ভানুসিংহ (রবীন্দ্রনাথ)	ভানুসিংহের পত্রাবলি
নীলঅঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায় (সংগীত)	৮৪	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ভারততীর্থ (কবিতা)	৮৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গীতাঞ্জলি
স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী (প্রবন্ধ)	৮৯	কমলা দাশগুপ্ত	'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী'
রাস্তায় ক্রিকেট খেলা (গল্প)	৯৫	মাইকেল অ্যানটনি / তরজমা তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	'রাস্তায় ক্রিকেট ও অন্যান্য গল্প'
দিন ফুরোলে (কবিতা)	১০২	শঙ্খ ঘোষ	
জাদুকাহিনি (গদ্য)	১০৬	অজিতকৃষ্ণ বসু	যাদু কাহিনী
গাধার কান (গল্প)	১০৯	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	
ভাটিয়ালি গান (সংগীত)	১১৭		
পটলবাবু ফিল্মস্টার (গল্প)	১১৯	সত্যজিৎ রায়	এক ডজন গপ্পো
চিন্তাশীল (নাটিকা)	১৩৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	হাস্যকৌতুক
দেবতাত্মা হিমালয় (ভ্রমণ কাহিনী)	১৩৯	প্রবোধচন্দ্র সান্যাল	দেবতাত্মা হিমালয় (১ম খণ্ড)
বই-টই (কবিতা)	১৪৬	প্রেমেন্দ্র মিত্র	
বই পড়ার কায়দাকানুন (গদ্য)	১৪৭		

অষ্টম শ্রেণি / (সাহিত্য মেলা)

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
বোঝাপড়া (কবিতা)	১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'ক্ষনিকা'
অদ্ভুত আতিথেয়তা (গল্প)	৬	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	'আখ্যানমঞ্জরী'
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে (সংগীত)	১১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
চন্দ্রগুপ্ত (নাটক)	১২	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	চন্দ্রগুপ্ত নাটক
বনভোজনের ব্যাপার (গল্প)	২৯	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	
নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ (গল্প)	৩১	নলিনী দাশ	
সবুজ জামা (কবিতা)	৪০	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
চিঠি (গদ্য)	৪২	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	
আলাপ (প্রবন্ধ)	৪৭	পূর্ণেন্দু পত্রী	

বিষয়	পৃষ্ঠা	কবি/লেখক/নাট্যকার	উৎসগ্রন্থ/মূল রচনা
পরবাসী (কবিতা)	৪৯	বিষ্ণু দে	
পথচল্‌তি (ভ্রমণ কাহিনী)	৫২	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	
একটি চড়ুই পাখি (কবিতা)	৫৯	তারাপদ রায়	
দাঁড়াও (কবিতা)	৬২	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	
পল্লীসমাজ (গদ্যাংশ)	৬৪	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পল্লীসমাজ
ছন্নছাড়া (কবিতা)	৭৪	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	
গাঁয়ের বধূ (সংগীত)	৮১	সলিল চৌধুরী	
গাছের কথা (প্রবন্ধ)	৮৩	জগদীশচন্দ্র বসু	'অব্যক্ত'
হাওয়ার গান (কবিতা)	৮৮	বুদ্ধদেব বসু	
কী করে বুঝব? (গদ্য)	৯২	আশাপূর্ণা দেবী	
পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি (কবিতা)	১০৩	জীবনানন্দ দাশ	'রূপসী বাংলা'
আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে (কবিতা)	১০৬	বিজয় সরকার	
নাটোরের কথা (স্মৃতিকথা)	১০৭	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'ঘরোয়া'
স্বাদেশিকতা (প্রবন্ধ)	১১৪	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
গড়াই নদীর তীরে (কবিতা)	১১৬	জসীমউদ্দিন	সোজনবাদিয়ার ঘাট
জেলখানার চিঠি (পত্র)	১১৯	সুভাষচন্দ্র বসু	
স্বাধীনতা (কবিতা)	১২৬	ল্যাংস্টন হিউজ / তরজমা- শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল গুহ	
আদাব (সংগীত)	১২৮	সমরেশ বসু	
ভয় কি মরণে (সংগীত)	১৩৮	মুকুন্দ দাস	
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)	১৩৯	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শান্তিনিকেতনে এক যুগ
ভালবাসা কি বৃথা যায়? (প্রবন্ধ)	১৪৬	শিবনাথ শাস্ত্রী	মুকুল, শ্রাবণ ১৩০২
ঘুরে দাঁড়াও (কবিতা)	১৪৯	প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	
সুভা (গল্প)	১৫১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
পরাজয় (সংগীত)	১৬০	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	
মাসিপিসি (কবিতা)	১৭২	জয় গোস্বামী	
টিকিটের অ্যালবাম (গল্প)	১৭৪	সুন্দর রামস্বামী / তরজমা অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত	
লোকটা জানলই না (কবিতা)	১৮২	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	
বই পড়ার কায়দাকানুন (গদ্য)	১৮৪		

১.৪. বিষয়বস্তুর ধারণা :

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার—এই তিনটি সংস্থার সহায়তায় প্রথম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ‘আমার বই’ প্রকাশিত হয়েছে। বইটির উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা প্রভৃতির কথা বইটির শেষে ‘শিখন পরামর্শ’ অংশে দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিশিক্ষণে বর্তমানে যে চারটি ভিত্তির কথা বলা হয়েছে—সেগুলি এখানে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উল্লিখিত চারটি ভিত্তি হল—

১. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child Centric Learning)

২. হাতেকলমে প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন (Activity-Based Learning)

৩. সমন্বিত শিখন (Integrated Learning)

৪. আনন্দময় শিখন (Joyful Learning)

এই চারটি বিষয় মনে রেখে বইগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে। বইগুলি পরিকল্পিত হয়েছে এমনভাবে যাতে শিক্ষার্থীরা সহজাত শিখন (Natural Learning)-এর মাধ্যমে ও কিছুটা শিক্ষকের সহায়তায় শিখন (Guided Learning)-এর মাধ্যমে, শিক্ষক থাকবেন সহায়ক (Facilitator) হিসেবে।

মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জানা শব্দ দিয়েই ভাষার রাজ্যে প্রবেশের পথ করে দেওয়া হয়েছে। অজানা শব্দগুলি এসেছে বয়স ও পরিণমন অনুযায়ী।

‘শিখন পরামর্শ’ শিক্ষকদের জন্য, এ থেকে শিক্ষকরা প্রচুর সহায়তা পাবেন। এই অংশে চারপাশের জগৎ থেকে পঠনপাঠন উপকরণ সংগ্রহ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিশুর মনোজগতের বিকাশের বহু উপাদান এই বইটিতে সুষ্ঠুভাবে সাজানো আছে। শিক্ষকগণ একটু মনোযোগী হলে সেই সৌন্দর্যের জগতে নিজেরা প্রবেশ করতে পারবেন ও শিক্ষার্থীদের প্রবেশে সাহায্য করতে পারবেন। তাই এই শিখন পরামর্শ সবার পড়া দরকার।

একটি শ্রেণির পাঠ্যবিষয়ের বিশ্লেষণ করলে মূলভাবনাটি স্পষ্ট হবে। প্রথম শ্রেণির ‘আমার বই’-তে শিশুর পাঠ্য প্রথম ভাষা বাংলা, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি ও গণিতের পাঠ্যসূচি একত্রে গ্রথিত হয়েছে। আমাদের আলোচনার বিষয় শুধু প্রথম ভাষা বাংলা। ‘সহজপাঠ’-কে ভিত্তিপাঠ করে কিছু পাঠ রচিত হয়েছে, আবার কিছু রচনা ‘সহজপাঠ’ এর ভিত্তিপাঠ। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ভাষা শিক্ষণ-শিখনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য ‘বাংলা’র। এই অংশটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত হল।

✸ বইটির ৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিছু ছবি স্কেচ আকারে আছে—শিক্ষার্থীরা সেগুলি বিভিন্ন রং ব্যবহার করে সম্পূর্ণ করবে ও এতে তারা রঙের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হবে।

✸ ৮৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে স্বরবর্ণের তালিকা।

✸ ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় রয়েছে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা।

✸ ৯৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে একটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্য যা আমাদের সকলেরই অবশ্যই জানা দরকার। যেমন—

পূর্ণমাত্রার বর্ণ—৩১টি।

অংশমাত্রার বর্ণ—৮টি।

মাত্রাহীন বর্ণ—১১টি।

✸ ৯৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে—কার চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন। অর্থাৎ—আ-কার, ই-কার প্রভৃতি এবং পরের পৃষ্ঠায় আছে ঈ-কার চিহ্নের উদাহরণ।

✸ ১০৭ পৃষ্ঠায় আছে শোনা-বলা যেটি শিশুশিক্ষার্থীদের শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

✸ ১৩৯ পৃষ্ঠায় আছে ছবি। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখবে আর মুখে মুখে গল্প বানিয়ে বলবে।

✸ ১৪৩ পৃষ্ঠায় আছে শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অর্থও জানবে।

✸ ‘ভোরের পাঠ’ আছে ১৫১ পৃষ্ঠায়। এই রচনার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দটিতে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে গেছে। হবে বড়োরা, মুদ্রিত রয়েছে বড়োরো।

✸ ১৫৭ পৃষ্ঠায় ছোটো ছোটো শব্দ ব্যবহার করে ছোটো ছোটো বাক্য লেখা হচ্ছে।

✸ ১৬৩ পৃষ্ঠায় বাক্য কাকে বলে বোঝানো হয়েছে- ‘শব্দ শুধু পাশাপাশি বসা মানেই বাক্য নয়, তাকে অর্থপূর্ণও হতে হবে।’

✸ ১৯২ পৃষ্ঠায় ‘পরিবার’ কবিতায় পরিবার সম্পর্কে একটি সুন্দর ধারণা চিত্রসহ দেখানো হয়েছে। এটির অন্তর্ভুক্তি তাৎপর্যবহ।

✸ ২১৩ পৃষ্ঠায় অনুকার শব্দগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে।

✸ ২১৮ পৃষ্ঠায় বাংলার পাখির কথা বলা হয়েছে। এই রচনাটি থেকে বাংলার বিভিন্ন পাখির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিশুশিক্ষার্থীরা অবগত হবে।

✸ ২২২ পৃষ্ঠায় একালের বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক কার্তিক ঘোষের ‘আমাদের ময়না’ কবিতাটি পড়বে এবং পাখির সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ জন্মাবে।

✸ ২৩১ পৃষ্ঠায় একালের বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘পাখিরা’ কবিতাটি শিক্ষার্থীদের আনন্দের ছড়া হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং পাখিদের বিভিন্ন স্বভাব সম্বন্ধেও তাদের ধারণা গড়ে উঠবে।

✸ ২৫৩ পৃষ্ঠায় চিত্রসহ একটি গাছ দেখানো হয়েছে। রচনাটি থেকে শিক্ষার্থীরা গাছের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবে।

✸ ২৬৩ পৃষ্ঠায় ‘বনেবাদাড়ে’ কবিতাটি শিশুদের কাছে আনন্দের ছড়া হিসেবে গৃহীত হবে এবং শিক্ষার্থীদের গাছপালাময় বনের জগৎ সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে উঠবে।

১.৪.১ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি ঃ

প্রথম শ্রেণি ঃ ‘আমার বই’-পাঠ্যপুস্তকে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত তিনটি বিষয়কে সমন্বিত আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠদান এবং শিশুকেন্দ্রিক পাঠদানের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বইটিতে শিক্ষার্থীরা নিজের কাজ নিজে করবে। ফলে বইটি শিক্ষার্থীদের একান্ত নিজের বলে মনে হবে এবং এর আকর্ষণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়মুখী হবে বলে মনে হয়।

আলোচ্য বইটিতে শিক্ষার্থীদের একান্ত নিজস্ব বই হিসাবে শিশুর নাম, মায়ের নাম, বাবার নাম, বিদ্যালয়ের নাম, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি লেখার জায়গা আছে। বিভিন্ন ছবি ও শব্দের মাধ্যমে তারা বর্ণ চিনবে ও ছবিতে যা যা আছে তা চিহ্নিত করবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিজে দেখে, চিনে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ছবিতে রং করে আনন্দ পাবে। এছাড়া অভিজ্ঞতালব্ধ শব্দ দিয়ে ছবি দেখে গল্প বলার মাধ্যমে শিশু ভাষার প্রয়োগও করতে শিখবে। ক্রমশ শিশু ভাষা পাঠে দক্ষ হয়ে উঠবে।

প্রকৃতি, জীব জগৎ ও জড় জগৎ অর্থাৎ পশু-পাখি, মাস, ঋতু, ফুল, হাট ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিশুদের জানাবার ও উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কর্মপত্রগুলিতে ভাষা-শিক্ষার কৌশলগত দিকের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাকে আনন্দময়, আকর্ষণীয় ও অপরিহার্য করে তোলার জন্য ছবি আঁকা, রঙ করা, গান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। এগুলি বিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত।

বর্ণময় ও বৈচিত্রময় ‘আমার বই’-এ শিশু নিজের ভাষাকে অবলম্বন করে সক্রিয়ভাবে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সবকিছু শিখবে। বইটি শিশুর জীবনকেন্দ্রিক। এখানে শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বক্তব্য এবং তার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ

দ্বিতীয় শ্রেণির ‘আমার বই’-তেও বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। হাতে কলমে নানা কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সামর্থ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। রং বেরঙের ছবির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে শিখন পরামর্শ। প্রথম শ্রেণির বই এর মতো এখানেও পাঠকে আনন্দদায়ক করে তোলা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণির বই-এর মতোই শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে এই বইটিতে। সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে সক্রিয়তামূলক কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে। যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ শেখানোর জন্য যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ সম্বলিত শব্দ তৈরি করে বাক্যে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। অনুশীলনের জন্য নানা উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। কর্মপত্র ও উপকরণগুলি এমনভাবে রয়েছে যাতে শিশুর অজান্তেই নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন করা যায়। এখানে গানেরও অবতারণা করা হয়েছে; এর মাধ্যমে শিশুরা আনন্দের সাথে সঠিক সুরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এছাড়া ঋতু, পাখি, প্রাণী, পারিবারিক সম্পর্ক, উৎসব, ঘরবাড়ি ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে। সাথে সাথে শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত সামর্থ্য অর্থাৎ শোনা, বলা, পড়া, লেখা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠবে।

তৃতীয় শ্রেণি ঃ

তৃতীয় শ্রেণিতে পাঠ্য বাংলা 'পাতাবাহার' বইটি গদ্য, পদ্য সম্বলিত এবং এটি জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫) অনুসরণে রচিত। নির্দিষ্ট ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ১০টি পাঠে বইটি রচিত। 'প্রচলিত গল্পকথার জগৎ' হল বইটির 'ভাবমূল'। বইটিতে শিশুরা মজার ছড়া, কবিতা, সাহসিকতার গল্প, মনীষীদের কথা, স্বদেশ কথা, স্বপ্নের কাহিনি, প্রতিবাদের গল্প ইত্যাদি বিষয় পড়বে। প্রতিটি পাঠের মাধ্যমে মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম পাঠের 'সত্যি সোনা', 'চাষ করি আনন্দে', 'নিজের হাতে নিজের কাজ'-এর মূলভাব হল কাজের প্রতি মর্যাদাবোধ এবং কাজের মধ্যে আনন্দ। ছবি আঁকার প্রতি শ্রদ্ধা তুলে ধরা হয়েছে 'দেওয়ালের ছবি' 'সারাদিন' প্রভৃতি পাঠে। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে তৃতীয় পাঠের 'ফুল', 'আজ ধানের ক্ষেতে' প্রভৃতি পাঠ্যাংশে।

প্রকৃতি ও তার সংরক্ষণের কথা আছে 'সোনা', 'নদী', 'নদীর তীরে একা' প্রভৃতি পাঠ্যাংশে। আর পঞ্চম পাঠের 'নৌকাযাত্রা', 'ঢেউয়ের তালে তালে', 'পর্যটন' প্রভৃতির মাধ্যমে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে। 'গাছেরা কেন চলাফেরা করে না' 'গাছ বসাব' প্রভৃতি বিষয় গাছ সম্পর্কে শিশুকে উৎসাহিত করবে। বন্ধুত্ব ও একাত্মতার কথা আছে সপ্তম পাঠের 'সাথী', 'একা একা থাকতে নেই' 'আরাম' প্রভৃতি পাঠে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে পাঠ্যাংশে আছে 'মন কেমনের গল্প', 'দেশের মাটি' আর নীতি কথা তুলে ধরা হয়েছে 'কে ছিলেন ঈশপ', 'পানতা বুড়ি', 'ঘুমিয়ো নাকো আর' পাঠে।

বিষয়বস্তুর সাথে সাথে শিক্ষার্থীকে ভাষার পাঠ এবং হাতে কলমে কাজের অভ্যাস তথা ভাষা ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভঙ্গী এবং ভাষা শৈলী গড়ে উঠবে। খেলার ছলে শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি পাবে, সৃজনাত্মক মনোভাব গড়ে উঠবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে, বুদ্ধির বিকাশ হবে, চারিত্রিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটবে। ভাষা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বন্ধন মুক্তির আনন্দ লাভ করবে।

চতুর্থ শ্রেণি ঃ

বাংলা ভাষায় সাবলম্বী করা ও মৌলিকতা আনার উদ্দেশ্যে জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা অনুসারে চতুর্থ শ্রেণির 'পাতাবাহার' বইটি রচিত। নিজের ভাষায় ও সুন্দর হাতের লেখায় গুছিয়ে বলতে পারা ও লিখতে পারার জন্য বিষয় বিন্যাস করা হয়েছে। ভাষার সামর্থ্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের অনুশীলন, সঙ্গীত, ছবি আঁকা, অভিনয় সংযোজিত করা হয়েছে।

বইটি বিষয় বৈচিত্র্য ও খেলার বর্ণনায় আকর্ষণীয় ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে। বইটির ভাবমূল 'রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও খেলার জগৎ'। কবিতায়, ছড়ায়, গল্পে, নাটকে, দেশবিদেশের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণময় প্রকৃতির বর্ণনা শিশুকে ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী করবে। প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতা বিষয়ক গান, মনীষী এবং বিপ্লবীদের জীবনকথা, দুঃসাহসী মানুষের জীবন কথা, বিশ্ব ভ্রমণের অভিনব অভিজ্ঞতার বিবরণ, খোলা আকাশের নীচে খেলে বেড়ানো প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলতানে বইটি সমৃদ্ধ।

পঞ্চম শ্রেণি ঃ

প্রথম শ্রেণি থেকে শিশুর যে ভাষা শিক্ষা শুরু হয়েছে তা শিখন ও প্রকাশের দিক থেকে যেভাবে ক্রমশ পরিণমনের দিকে এগিয়েছে তা লক্ষ্য রেখেই পঞ্চম শ্রেণির 'পাতাবাহার' বইটি রচিত। রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা বইটির মূলভাব। ছড়া, কবিতা, গান,

গল্প, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানব মনের কল্পনা। শিক্ষার্থীরা এই শ্রেণিতে রূপকথা, বন্ধুত্ব আর সহানুভূতির গল্প জানবে। আদিবাসীদের জীবন কথা, প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতার গান, লোকজীবনের কথাও জানবে। মানুষের কঠোর সংগ্রাম, তারুণ্যের স্বপ্ন, শিক্ষামূলক কবিতাও পড়বে।

শিক্ষার্থীরা পাঠ এককগুলি দলগত ও এককভাবে পড়তে পারবে এবং রস গ্রহণ করবে। হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে সক্রিয়তাভিত্তিক ও আনন্দময় শিখন ঘটবে। ফলে শিশু সামাজিক হয়ে উঠবে এবং তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতা, ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

১.৪.২. ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি ঃ

ষষ্ঠ শ্রেণি ঃ

ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্য বইটির নাম 'সাহিত্যমেলা'। এই বইটির ভাবমূল হল আমাদের 'চারপাশের পৃথিবী'। প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের রচনায় বইটি সমৃদ্ধ। লেখাগুলির মধ্যে চারপাশের জগতের বিভিন্ন অভিমুখ প্রকাশিত হয়েছে। ছড়ায়, গানে, গল্পে, গদ্যে, ছবিতে চারপাশের জগতের বৈচিত্র্যময় দিক ফুটে উঠেছে। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বতের সঙ্গে সঙ্গে উৎসব, খেলাধুলা, বিনোদন প্রভৃতি বিষয়ও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে জগতের প্রাণময় অস্তিত্ব শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সক্রিয়তাভিত্তিক কাজও এই বইটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদের পাঠে উৎসাহিত করা এবং ভাষাপাঠে আরও দক্ষ ও সমৃদ্ধ হবার জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া দ্রুত পঠন বইটি সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য রঙিন কল্পনার পরিসর রয়েছে। এই বইটির মাধ্যমে তাদের মধ্যে সাহিত্য বোধ সঞ্চারিত হবে এবং তাদের কল্পনাশক্তি প্রসারিত হবে।।

সপ্তম শ্রেণি ঃ

সপ্তম শ্রেণিতে পাঠ্য 'সাহিত্যমেলা' বইটিও জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫ অনুসারে রচিত। এই বইটির মূল বস্তু হল 'সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান'। ছড়া, কবিতা, গান, গল্প, নাটকের মাধ্যমে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে; সঙ্গে মানব মনের কল্পনা যুক্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই বইতে বিজ্ঞানের গল্প, ভাষা আন্দোলনের গদ্য ও কবিতা, শিল্পী ও চিত্রকরের আত্মকথা, ছবি আঁকার গল্প, গানের গল্প, জাদু কাহিনি, খেলার গল্প, নাটক প্রকৃতি-স্বদেশ বিষয়ক গান, মনীষী ও বিপ্লবীদের কথা জানতে পারবে। আর আছে চিঠি লেখা, গল্প সম্পূর্ণ করা এবং অনুচ্ছেদ রচনা ইত্যাদি সক্রিয়তাভিত্তিক কাজগুলি রয়েছে। শিক্ষার্থীর সৃষ্টিমূলক কাজকর্ম করার চিন্তা ভাবনা ও তা সম্পন্ন করার ক্ষমতাও অর্জিত হবে। শিক্ষামূলক কাজকর্মের দ্বারা শিক্ষার্থী পরিণমনের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হবে এবং মৌলিক প্রকাশ ক্ষমতার অধিকারী হবে। এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দ্রুত পঠন হিসাবে লীলা মজুমদারের উপন্যাস 'মাকু' সংযোজিত হয়েছে। এখানে কল্পনার রঙিন জগতের সঙ্গে যেমন শিক্ষার্থীদের পরিচয় হবে তেমনই বিভিন্ন মূল্যবোধও সঞ্চারিত হবে।

অষ্টম শ্রেণি ঃ

অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্য 'সাহিত্য মেলা' বইটির ভাবমূল 'বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি'। শিক্ষার্থীরা বন্ধুত্ব, সমানুভূতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বইটির বিভিন্ন পাঠে পড়বে। অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানে পাঠগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রয়েছে গান, কবিতা, গল্প, নাটক ইত্যাদি। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনার দ্বারা বইটি সমৃদ্ধ। সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন সম্ভারও রয়েছে এই বইয়ে। এই বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মুক্ত চিন্তার চর্চার পরিসর পাবে এবং বিভিন্ন অর্জিত সামর্থ্যগুলিরও চর্চার সুযোগ পাবে। অষ্টম শ্রেণিতে দ্রুত পঠন হিসাবে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের সম্পাদিত রূপ ছোটদের 'পথের পাঁচালী' সংযোজিত হয়েছে। এই পাঠ শিক্ষার্থীদের বই পড়ায় আগ্রহান্বিত করবে। মানব-সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তাদের কাছে উন্মোচিত হবে। বইয়ের শেষে শিখন পরামর্শও যুক্ত হয়েছে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

(১) প্রথম শ্রেণির বইটির মূল বৈশিষ্ট্য কী?

(২) ব্যাকরণ শিক্ষা কোন শ্রেণি থেকে শুরু করা হয়েছে?

(৩) সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য পুস্তকের নির্বাচিত এককগুলি কতটা 'ভাবমূল' অনুসারী ব্যাখ্যা করুন।

১.৫. সারসংক্ষেপ ঃ

জ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাতেই মাতৃভাষার অবাধ বিচরণ। তাই ‘মাতৃভাষার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন’—একথা অসত্য নয়; ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের জন্য মাতৃভাষাই আজ শিক্ষার বাহন। সে কথা মনে রেখেই প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলি রচিত। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা অনুসারে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি রচিত। আর প্রতিটি শ্রেণিতেই বইগুলি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রচনা করা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাকে আরও আনন্দদায়ক ও শিশুকেন্দ্রিক করে তোলার জন্য শিশুর সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভাষা শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ব্যাকরণ শিক্ষার উপরও এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১.৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠ্য বাংলা বইটির নাম কী ?

(২) হ-য-ব-ব-ল কোন শ্রেণিতে কী হিসাবে পাঠ্য ?

(৩) ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠ্য বাংলা বইটির নাম কী ?

(৪) ‘পথের পাঁচালী’ কার লেখা ?

(৫) ‘পল্লীসমাজ’—কোন শ্রেণিতে পাঠ্য ?

সংক্ষিপ্ত/রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা অনুসারে কীভাবে প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলি রচিত তা উদাহরণসহ দেখান।

(২) উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলি কি শিক্ষার অধিকার আইন-কে মান্য করে রচিত— আলোচনা করুন।

(৩) প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণ শিক্ষা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা আলোচনা করুন।

(৪) ‘সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠদান প্রাথমিক স্তরের মূলভিত্তি’— আলোচনা করুন।

অধ্যায়

২

বাংলা ভাষা শিখন-শিক্ষণের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

২.১. সূচনা

মানুষ নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে এবং অন্যের অনুভূতি ও বস্তুজগৎকে জানে ভাষার মাধ্যমে। কোনো নির্দিষ্ট জনজাতি তার সমাজে বা গোষ্ঠীতে মাতৃভাষার মাধ্যমেই যোগাযোগ রক্ষা করে। ফলত মাতৃভাষা সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ অত্যন্ত জরুরী।

ভাষা হলো একটি নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য সংকেতাবলী। যা দৃশ্য ও শ্রাব্য দুরকমেরই হতে পারে। জন্মাবার পর থেকে শিশু তার চারপাশের মানুষের ব্যবহৃত এই সকল সংকেতকেই বুঝে নিতে চায়। এই প্রক্রিয়ায় তাকে তার পরিবেশ ও সেখানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সাহায্য করে। জন্মাবার পর অপরিচিত বিশ্বকে শিশু তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিপার্শ্বের মানুষের কাছ থেকে যে দৃশ্য ও শ্রাব্য সংকেতের মাধ্যমে শেখে তাকেই তার মাতৃভাষা বলে। অর্থাৎ মাতৃভাষা (Mother tongue) হল শিশুর শৈশবে শেখা প্রধান ভাষা।

Mother Language বা উৎস-ভাষার সঙ্গে আমরা মাতৃভাষা বা Mother tongue-কে গুলিয়ে ফেলব না। আবার ‘মাতৃভাষা’ অর্থে আজ আর শুধু মায়ের মুখের ভাষা বোঝায় না। বর্তমানে কর্মসূত্রে অনেকেই প্রবাসে থাকেন। তাদের শিশুদের ক্ষেত্রে তখন স্থানীয় ভাষাই মাতৃভাষা হয়ে ওঠে। নিজের ঘরে ব্যবহৃত ভাষাটি হয়ে ওঠে ‘গৃহভাষা’।

২.২. উদ্দেশ্য ঃ

(১) মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

(২) শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

(৩) মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কেন কার্যকর তা বুঝতে পারা।

(৪) প্রারম্ভিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

২.৩. মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা ঃ

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়। মাতৃভাষা শুধু একটি পাঠ্যবিষয় নয়; তা বিদ্যালয় জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ। মাতৃভাষা শুধু শিক্ষাদানের মাধ্যম নয় বরং অস্তিত্ব রক্ষার একটি শর্ত।

অর্থাৎ মাতৃভাষা শুধু ভাবপ্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম নয় তা আমাদের সমাজজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতএব শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষায় দক্ষ করে তোলার অর্থ তার আত্মবিকাশকে সহজ ও সুগম করা।

২.৩.১ মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

মাতৃভাষা শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. গ্রহণমূলক ২. অভিব্যক্তিমূলক ও প্রকাশমূলক ৩. রসসঞ্চারমূলক ৪. সৃজনাত্মক।

১. গ্রহণমূলক ভূমিকা -(Receptive function) ঃ কোনো শ্রাব্য সংকেতকে ডিকোড (decode) করতে পারার ক্ষমতা অর্থাৎ সহজ ভাষায় কোনো কিছু শুনে তা বুঝতে পারার ক্ষমতা অর্জন করা। একইভাবে সংকেতের (Sign) দৃশ্যরূপকে decode করতে পারার ক্ষমতা অর্থাৎ লিখিতভাষাকে পড়ে বুঝতে পারার ক্ষমতা অর্জন করা।

২. অভিব্যক্তিমূলক ও প্রকাশমূলক ভূমিকা - (Expressive function) ঃ অর্থপূর্ণ শ্রাব্য সংকেতের মাধ্যমে বক্তব্যকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন। অর্থাৎ কথনের দ্বারা কোনো বিষয়কে পরিস্ফুট করার ক্ষমতা অর্জন।

একইভাবে লিখিত সংকেতের দ্বারা কোনো বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে পারা অর্থাৎ মাতৃভাষায় লিখিতভাবে নিজের বক্তব্যকে গুছিয়ে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করা।

৩. রসসঞ্চারমূলক ভূমিকা - (Appreciative function) ঃ কথন ও লিখন যদি রসগ্রাহী না হয় তাহলে তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে না। ফলত রসগ্রাহী কথন ও লিখনে পারদর্শী হওয়াটা মাতৃভাষা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

৪. সৃজনাত্মক ভূমিকা - (Creative function) ঃ আমরা জানি মানুষ স্বল্প সংখ্যক শব্দ ও নিয়মের উপর নির্ভর করে অসংখ্য বাক্য বিন্যাস প্রতিনিয়ত করে চলেছে। নিজের বক্তব্য প্রকাশের সময় এই সৃজনশীলতা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে যদি শিক্ষার্থী তার অনুভূতি ও উপলব্ধিকে প্রচলিত ধারনার বাইরে বেরিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য ও উপভোগ্য করে তুলতে পারেন।

এখন মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে একত্র করলে দেখব ঃ

- শিশুকে সমাজ জীবনের উপযোগী করে তোলা।
- শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম করে তোলা।
- অপরের বক্তব্য শুনে বুঝতে পারার ক্ষমতা অর্জন করা।
- হাতের লেখা, ছাপানো বই, খবরের কাগজ ইত্যাদি লিখিত বিষয়বস্তু নির্ভুল ও স্পষ্ট উচ্চারণে সরব ও নীরব পাঠ স্বাধীনভাবে করে তার অর্থ বুঝতে পারা।
- নিজের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান ও অনুভূতিকে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখতে পারা।
- প্রাথমিক স্তরের উপরের শ্রেণিতে কবিতা পাঠে আবৃত্তি ও অর্থবোধে অতিরিক্ত একটি নতুন মনোভাব গঠন করতে পারা।
- শব্দ-সম্ভার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন শব্দগুলিকে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারার কৌশল অর্জন করতে পারা।
- মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় যেমন ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সক্ষমতা অর্জন করতে পারা।
- মাতৃভাষায় লিখিত মহৎ সাহিত্য পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা।
- মাতৃভাষা শিক্ষা ও তার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা শিশুর স্বাভাবিক দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করা

২.৩.২ মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. মাতৃভাষার মাধ্যমেই একজন শিশুর সুষ্ঠু আত্মবিকাশ সম্ভব।
২. শিশু মাতৃভাষার মাধ্যমেই সামাজিক ও মানবিক বন্ধনগুলিকে চিনতে শেখে। যার দ্বারা যে সমাজ জীবনের উপযোগী হয়ে ওঠে।
৩. মাতৃভাষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।
৪. আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভ্যাস, বিশ্বাস, লোকাচার মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।
৫. মূল্যবোধ সৃষ্টির ও বুদ্ধির বিকাশে মাতৃভাষা সবচেয়ে বেশি সহায়ক।
৬. মাতৃভাষার মাধ্যমেই কল্পনা শক্তির যথার্থ বিকাশ হয় এবং তা প্রকাশে মাতৃভাষাই সর্বোত্তম মাধ্যম।
৭. মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তৈরি না হলে অপর কোনো ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জন্মায় না।
৮. মাতৃভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্যও মাতৃভাষা চর্চা জরুরী।

২.৪ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও সংজ্ঞা ঃ

মাতৃভাষার সংজ্ঞা ঃ সাধারণভাবে বলা যায় যে ভাষা ব্যক্তি জন্ম থেকে শেখে, অনায়াসে বলতে পারে, যা তার সমাজতাত্ত্বিক পরিচয়ের ভিত্তি সেই ভাষাই তার মাতৃভাষা।

একটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে দেখলে মাতৃভাষার পরিসর স্পষ্ট হয়ে যায়—

The general usage of the hram mother tongue deuter not only the language one learns from one's mother, but also the speaker's dominant and home language, is not only the first language according to the time of acquisition, but the first with regard to its importance and the speaker's ability to master its linguistic and communicative aspects.

Axious Challenging the traditional : Translation Into a Non-mother tongue, Hohn Benjamins

শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাতৃভাষা তার সঙ্গী। তার আয়ত্ত করা প্রথম ভাষা, তার যোগাযোগের সর্বোত্তম মাধ্যম।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথের মতো শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সওয়াল করেছেন। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষার গুরুত্বগুলি নিম্নরূপ—

১। জন্ম থেকে শিশু মাতৃভাষায় অভ্যস্ত। তাই জীবনের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

২। ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অসীম। বর্তমানে যেসব শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় তাদের অনেকেই প্রথম প্রজন্মে শিক্ষার্থী। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় থাকে না বললেই চলে, তাই এদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকেই গ্রহণ করা উচিত।

৩। মাতৃভাষায় শিক্ষার্থীর অনায়াস দখল থাকে, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় রোধ হয়।

৪। শিশু বয়সে বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করা কষ্টকর। সেক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে শিক্ষা আনন্দময় হয়ে ওঠে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব ঃ

১। এই স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে অন্য ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মাতৃভাষায় সঠিক ভিত্তি অন্য ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করে।

২। এই স্তরে পাঠ্যবিষয়ের সংখ্যা ও পরিধি ব্যাপ্তি পায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় অনায়াসে বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করা যায়, অনুবন্ধ পদ্ধতিতে এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সেতুবন্ধন সহজ হয়।

৩। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগের নানারকম বহিঃপ্রকাশ ঘটে, মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যপাঠে এই আবেগের উদ্‌গতিসাধন সম্ভব।

৪। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর চিন্তনশক্তি, যৌক্তিক ক্ষমতার বিকাশ সাধন সহজে হয়।

৫। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সৃজনক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

৬। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা মাতৃভূমির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটায়।

৭। মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

(১) মাতৃভাষা শিক্ষা কেন প্রয়োজনীয়?

(২) মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য কী?

(৩) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২.৫. প্রারম্ভিক স্তরে মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার স্বপক্ষে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি এবং শিক্ষাবিদদের অভিমত ঃ

২.৫.১. শিক্ষাবিদদের অভিমত ঃ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, ‘‘যাঁহারা আশা করিয়া নিশ্চিন্তে আছেন যে বাঙালী জনসাধারণ এককালে ইংরেজিতে পন্ডিত হইয়া উঠিবে, তখন আর বাংলা ভাষায় কোনো বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রণয়নের আবশ্যকতা থাকিবে না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমার সে আশা নাই। বাংলার জনসাধারণ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজি ধরুক সে আকাঙ্খা আমার মনে প্রবেশ করিতেও পারে না। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজির স্থানে বাঙ্গালা আসিয়া বসিবে, আমি বরং সেই দিনের আশা রাখি।’’

রামেন্দ্রসুন্দরের সেই আশা আজ অনেকাংশেই ফললাভ করেছে। গান্ধীজীও তার বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার প্রাধান্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

দান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ড. জাকির হোসেন, আব্দুল কালাম আজাদ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয় স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি পায়। সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছিলেন ''জেনে আনন্দিত হলাম যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করেছে। আমাদের চাইতে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছাত্রদের বাংলা সাহিত্যে আরও গভীর মনোনিবেশ করা উচিত। আমার শিক্ষায় যাকে আমি খুঁত বলে মনে করি তা হল বাংলা সাহিত্যে আমার বিশাল অজ্ঞতা এবং কেবলমাত্র এখনই আমি সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করছি।''

অন্যদিকে চলিত বাংলার প্রসারে ব্রতী হলেন প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বললেন 'লিখিত বাংলা ও কথিত বাংলা এত তফাত হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটিকে এক ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। ...... গ্রন্থকারেরা বাংলা ভাষা না শিখিয়া বাংলা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন তাহার প্রতিকার করা শক্ত।'' 'নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধেও হরপ্রসাদ কঠিন কঠিন পরিভাষা সৃষ্টির পরিবর্তে সহজ সরল প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আরো জোর দিয়ে লিখলেন ''চলিত ভাষায় কি আর শিল্প নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পান্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, ... যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশ জনে বিচার কর – সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? ..... যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে।'' একথারই বাস্তব স্বীকৃতি পাই অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের একটি সাক্ষাৎকারে। যেখানে তিনি জানান চৌত্রিশ সংখ্যার পর তিনি আর ইংরেজি গুনতে পারেন না বরং তার জায়গায় বাংলা সংখ্যাগুলি ভিড় করে। আসলে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ বোঝাতে চেয়েছেন বিশ্বের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন বিদেশী ভাষাতে শিক্ষাচর্চা ও শিক্ষাদান করলেও তিনি চিন্তাটা বাংলা ভাষাতেই করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মাতৃভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছিলেন ''ভাব ও চিন্তা যেমন ভাষার জন্মদান করে ভাষাও তেমনি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত, সুসম্বন্ধ ও শৃঙ্খলিত করে। .... বাঙ্গালী বাংলা ছাড়া চিন্তা করিতে পারে না, ইংরাজ ইংরাজি ছাড়া ভাবিতে পারে না। তাদের পক্ষে মাতৃভাষা ভিন্ন যথার্থ-চিন্তা যেমন অসম্ভব, বাঙালীর পক্ষেও তেমনি। তা যিনি যত বড়ো ইংরাজি-জানা মানুষই হউন।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছেন, ''শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।''

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

১. বাংলা ভাষায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দুটি প্রবন্ধের নাম করুন যেখানে চলিত ও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের কথা বলা আছে।

২. মাতৃভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন মনীষীদের রচনার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

২.৫.২. বিভিন্ন কমিশন ও মাতৃভাষা ঃ

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে শিক্ষাবিদরা যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনই বিভিন্ন কমিশনও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকাল ঃ

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে সুপারিশ করেছিলেন। আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তিনি আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারও চেয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলে মেকলে যদিও কিছু করণিক তৈরির শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন তবুও 'উডের ডেসপ্যাচ'-এ (Wood's Despatch) ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষাগুলিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হলো। লেখা হলো "We look therefore, to English language and to the vernacular language of India together as the media for the diffusion of European Knowledge...."

হান্টার কমিশনে (১৮৮২-৮৩) প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি জানানো হয়।

পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষার উপর আরও গুরুত্ব দিলেন। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল—

"English has no place and should have no place in the scheme of primary education".

মাধ্যমিক স্তরেও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—মাধ্যমিক স্তরে কোনো শিক্ষার্থীই মাতৃভাষা ত্যাগ করতে পারবে না।

"No scholar in a secondary school should even them to allowed to abandon the study of vernacular".

স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯ খ্রিস্টাব্দ) বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঃ

এই কমিশনের প্রস্তাব জনমানসে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। কেননা এই কমিশনের সুপারিশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় মাতৃভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রস্তাবে লেখা হয় -

"The mother tongue ought to be given a place as the medium of instruction throughout the high school stage."

যদিও এরপর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মাতৃভাষাকে বিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকাল ঃ

রাধাকৃষ্ণান কমিশন (১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

স্বাধীনতা লাভের পর ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেই নয় উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও ইংরেজির পরিবর্তে ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "It is educationally unsound to make a Foreign tongue the means of acquiring knowledge."

মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতাগুলি দূর করার কথা রাধাকৃষ্ণান কমিশনে উল্লিখিত হয়েছিল। সে কারণেই মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ড. লক্ষ্মনস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেই নয়-শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকেই মাধ্যম করার কথা সুপারিশ করে। সুপারিশে লেখা হল—

"Mother tongue or the regional language should generally be the medium of instruction throughout the secondary stage...." এছাড়াও লেখা হল-

"Mother-tongue or regional language would have been the medium of instruction at all stages of the Educational Ladder."

এই কমিশন মাতৃভাষার ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেন। যেখানে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা পৃথক, সেখানে সংখ্যালঘু ভাষা সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করতে হবে।

কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ)

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (Central Advisory Board of Education) ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় 'ত্রিভাষা সূত্র' বা Three Language Formula-র কথা উপস্থাপন করে। কোঠারি কমিশন এই ত্রিভাষা সূত্রকে মেনে নেয়। অর্থাৎ ভাষা শিক্ষায় মাতৃভাষার পাশাপাশি আরো দুটি ভাষা শিক্ষার সুপারিশ করেন। সুপারিশের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে শুধুই মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা, ইংরেজি বা হিন্দি এবং অন্য একটি আধুনিক ইউরোপীয় বা ভারতীয় ভাষা।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা ও উপরিলিখিত যে কোনো একটি ভাষা।

১৯৮৬তে জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে ভবতোষ দত্ত কমিশন, অশোক মিত্র কমিশন (১৯৯১-৯২) এবং পবিত্র সরকার কমিশনও (১৯৯৮) প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে বলেছেন। যদিও কোন শ্রেণি থেকে ইংরেজি ভাষা শেখানো হবে তা নিয়ে এঁদের মতানৈক্য ছিল।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

১. উডের ডেসপ্যাচে মাতৃভাষা সম্পর্কে কী উল্লেখ ছিল?

---

২. ভাষাশিক্ষার ইতিহাসে কোঠারি কমিশন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

---

৩. মুদালিয়র কমিশনে মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে কী কী সুপারিশ করা হয়েছিল?

---

৪. স্যাডলার কমিশনে মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে কী বলা হয়?

২.৬. সারসংক্ষেপ

- শৈশবে শেখা প্রধান ভাষাই হলো মাতৃভাষা।
- মাতৃভাষা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো শিশুর সর্বাঙ্গীন স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশে সহায়ক হওয়া।
- শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অসীম।
- শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা ব্যবহারের পক্ষে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ মতামত দিয়েছেন ও প্রয়োজনে আন্দোলন করেছেন।
- পরাধীন ভারতবর্ষেও মাতৃভাষা বিদ্যালয় শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হওয়া উচিৎ বলে বিভিন্ন কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিল।
- স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিশন মাতৃভাষাকে শুধু প্রাথমিক স্তরেই নয় উচ্চশিক্ষায় ব্যবহারের পক্ষেও সুপারিশ করেছে। ভাষা শিক্ষায় 'ত্রিভাষা সূত্র' গৃহীত হয়েছে।

২.৭ অনুশীলনী

১. ‘গৃহভাষা’ ও ‘মাতৃভাষা’-র মধ্যে পার্থক্য কী?

২. কোথায় প্রথম ত্রিভাষা সূত্রের কথা বলা হয়?

৩. চলিত ভাষা ব্যবহারের সপক্ষে যুক্তিদান করেছেন এমন তিনজন মনীষীর নাম করুন।

৪. প্রাথমিক স্তরে শুধুই মাতৃভাষা শেখা উচিৎ কিনা সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিন?

৫. স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর শিক্ষা কমিশনে মাতৃভাষা সংক্রান্ত সুপারিশে কী কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? আপনার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিন।

অধ্যায়

৩

বাংলা ভাষা শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রয়োগ

৩.১. সূচনা

'কি পড়ব' সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, 'কীভাবে পড়বো' সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর পঠন পাঠনের আছে বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি। তেমনই আছে পাঠদানেরও বিভিন্ন পদ্ধতি। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পাঠদান পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে কোন পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে নানা মত আছে।

বাংলা ভাষা শিক্ষা বা মাতৃভাষা শিক্ষাদানের (প্রাথমিক পর্বে) যে পদ্ধতিগুলি আমরা অনুসরণ করি, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল— (1) শব্দানুক্রমিক পদ্ধতি (2) বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি (3) বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি (4) অভিনয় পদ্ধতি (5) অনুকরণ পদ্ধতি (6) অনুবন্ধ পদ্ধতি (7) বিবৃতিমূলক পদ্ধতি (8) আলোচনা পদ্ধতি (9) প্রকল্প পদ্ধতি (10) ছড়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি।

শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন সে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে কিন্তু ভাষার গঠনগত দিক কিছুই প্রায় জানে না। শিক্ষকের দায়িত্ব হল বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সেগুলিকে যত্ন করে শেখানো।

৩.২. উদ্দেশ্য ঃ

★ ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতিকে কীভাবে শিশুকেন্দ্রিক করে তোলা যায় সে সম্বন্ধে অবহিত করা।

★ ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তোলার প্রক্রিয়া অনুধাবন করা।

★ শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

★ বাস্তব পরিবেশ বিবেচনা করে পাঠদান করা।

★ বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করা।

★ জানা বিষয় (উদাহরণ) থেকে অজানা বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া।

★ শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আরও ব্যবহারিক করে তোলা।

★ কোন পদ্ধতি কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য তা বুঝতে সাহায্য করা।

৩.৩. বিভিন্ন পদ্ধতির তাৎপর্য ঃ

৩.৩.১. শব্দানুক্রমিক পদ্ধতি ঃ

প্রথমে পরিচিত সহজ সরল শব্দ চিনিয়ে উচ্চারণ শিখিয়ে পরে সেই সব শব্দকে বিশ্লেষণ করে বর্ণ শেখানোর পদ্ধতিকে বলা হয় শব্দানুক্রমিক পদ্ধতি।

যেমন ঃ

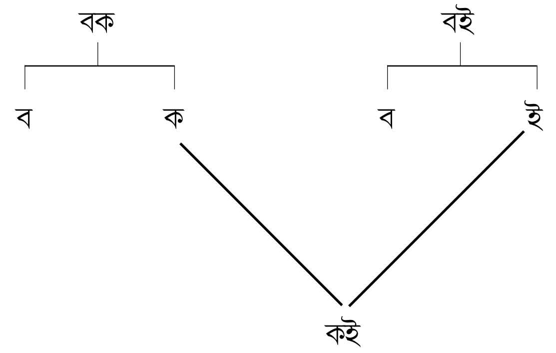

এখানে প্রথম শ্রেণিতে পাঠ্য 'আমার বই' থেকে উদাহরণটি নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি 'বক' শব্দটি থেকে শিক্ষার্থীদের 'ব' ও 'ক' বর্ণদুটি শেখানোর কথা বলা হয়েছে। অনুরূপে 'বই' শব্দটি থেকে 'ব' ও 'ই' বর্ণ দুটি শিখবে। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে 'বক' শব্দের 'ক' আর 'বই' শব্দের 'ই' এই বর্ণ দুটি নিয়ে 'কই' (মাছ) শব্দটি ও শিক্ষার্থীদের শেখানো যাবে।

মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনেকটাই মনোবিজ্ঞানসম্মত কারণ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পরিচিত শব্দ থেকেই পাঠদান শুরু করা হয়। সেই সঙ্গে শিক্ষক বর্ণবিশ্লেষণ করে প্রত্যেকটি বর্ণ নির্দিষ্ট করে সেইসব বর্ণগুলি চিনতে, পড়তে ও শিখতে শেখাবেন। আবার নতুন শেখা বর্ণগুলি দিয়ে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন শব্দও তৈরী করতে পারবে। এইভাবে শিক্ষার্থীদের শব্দ ভান্ডারের জ্ঞান ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে ও তারা সমৃদ্ধ হবে।

শব্দানুক্রমিক পদ্ধতির গুরুত্ব ঃ

★ শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকেই শব্দ চয়ন করা হয়ে থাকে বলে শিশুরা পাঠে উৎসাহিত হয় ও আনন্দ পায়।

★ দলগতভাবে খেলাধূলার মাধ্যমেও এই পদ্ধতি শেখানো যায়।

★ এই পদ্ধতিতে শিক্ষা স্থায়ী বা দৃঢ় হয়। কারণ আনন্দের সঙ্গে শেখা বিষয়বস্তু শিশুরা সহজে ভুলে যায় না।

★ যেহেতু দৈনন্দিন জীবনে শিশুর সমস্ত কিছুই শব্দ দিয়ে ঘেরা। তাই শব্দকে কেন্দ্র করে ভাষা শিক্ষাদান শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিশু মনস্তত্বসম্মত একটি পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত।

★ নতুন নতুন শব্দ তৈরির কৌতূহল শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঠন ক্ষমতা ও বাচনের প্রসার বাড়বে।

শব্দানুক্রমিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ঃ

★ এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ। তাই এই পদ্ধতিতে বর্ণমালা শিখতে অনেক সময় লাগে।

★ ক্রম অনুসারে বর্ণশিক্ষা না হবার ফলে শিক্ষার্থীদের ভুলে যাবার প্রবণতা অনেক বেশি চোখে পড়ে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সহজেই ভুলে যায়।

৩.৩.২. বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতি বর্ণবিধির অনুসরণে প্রথমে শিক্ষার্থীদের বর্ণমালার জ্ঞান দেওয়া হয়। বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী প্রথমে ১১টি স্বরবর্ণ ও ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে পরিচয় করাতে হবে। এখানে প্রথমে শিক্ষার্থীদের বর্ণগুলির উচ্চারণ শেখানো হয় এবং তারপর সেই বর্ণের হরফগুলি লিখতে শেখানো হয়। সাধারণত লেখা শেখানোর ক্ষেত্রে প্রথমে বর্ণগুলি শিক্ষক স্লেট বা খাতাতে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীরা সেগুলির উপর দাগ বোলাতে থাকে। এরপর কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে লিখবে।

বর্তমানে প্রথম শ্রেণিতে পাঠ্য 'আমার বই'-এর প্রথম দিকে স্বরবর্ণ মালা ও ব্যঞ্জন বর্ণমালা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে বর্ণ শেখার পর শিক্ষার্থীরা বর্ণকার্ডের সহযোগে বিভিন্ন শব্দ শিখবে এবং বর্ণ ও চিনতে পাবে। এই বই-এর পরবর্তী অংশে সেগুলি উদাহরণ দ্বারা ছবিসহ তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

যেমন —

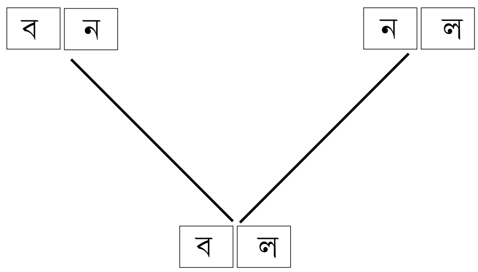

এখানে বর্ণ শিখিয়ে সেখান থেকে নতুন শব্দ তৈরী শেখানো হয়েছে।

বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির গুরুত্ব ঃ

★ শিক্ষার্থীরা বর্ণগুলি বিশ্লেষণ করে সেগুলি চিনতে, পড়তে ও লিখতে শেখে।

★ অনেক শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে দ্রুত ও সহজে শিক্ষাদান দেওয়া যেতে পারে।

★ শেখানো বর্ণগুলি দিয়ে নতুন কোন শব্দ শিশুর জানা থাকলে, তা জেনে নিয়ে অনুরূপভাবে আরো নতুন শব্দ শিখতে পারবে।

★ আনন্দদায়ক পাঠ বলে এটি স্থায়ী ও দৃঢ় হয়। শিশু সহজে ভুলে যায় না।

★ এই পদ্ধতিকে মাতৃভাষা পাঠদানের প্রথম প্রস্তুতি পর্ব বলা চলে।

বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ঃ

★ ক্রম অনুসারে বর্ণ মনে রাখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় তা ভুলে যায়।

★ অনেক ক্ষেত্রে না বুঝে মুখস্থ করে চলে শিশুরা

★ এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়।

★ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি প্রাচীন পদ্ধতি তাই বর্তমানে কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। বিশেষত শিশুকেন্দ্রিকতার নিরিখে।

৩.৩.৩. বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি ঃ

শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন সে স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ অর্থবোধক একটি বাক্য বলতে পারে। কিন্তু তার গঠনগত দিক বা লিখিত রূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা থাকে না। তাই উদ্দেশ্য মূলকভাবে জানা বাক্য থেকে শব্দ নির্বাচন করে সেই শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ করে বর্ণ শেখানো হয়। যেমন—

(ক) আমি [আম] খেতে ভালবাসি ⇒ আম → আ, ম

(খ) বনে [বাঘ] থাকে ⇒ বাঘ → বা, ঘ

(গ) সাদা [বক] পাখা মেলেছে ⇒ বক → ব, ক

এখানে বাক্য > শব্দ > বর্ণ শেখানো হয়েছে। তাই একে বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে ছড়ার মাধ্যমে শেখানো যায়। যেমন— যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা ‘হাসিখুশি’-আছে—

★ অ-অজগর আসছে তেড়ে।

★ আ-আমটি আমি খাব পেড়ে।

বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতির গুরুত্ব ঃ

★ এই পদ্ধতিতে পাঠদানকালে শিশু একটি সম্পূর্ণ চিন্তা করতে পারে।

★ শিক্ষার্থীদের চিন্তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আসে।

★ শ্রুতিমধুরতার ও কার্যকারিতার মাধ্যমে, ছড়া বলে এই পদ্ধতি শেখানো যথেষ্ট আনন্দদায়ক।

★ শিশুর প্রকাশভঙ্গিগ প্রসারিত হবে এই পদ্ধতিতে।

★ শিশুর পড়ার গতি দ্রুত হয় এই পদ্ধতিতে।

★ মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অধিকতর মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং বর্তমানে অধিক স্বীকৃত পদ্ধতি।

★ বাক্যগঠন সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আংশিক ধারণা জন্মায় এবং সহজ-সরল বাক্য লেখার প্রবণতা তৈরি হয়।

বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ঃ

★ অনেক সময় শিক্ষার্থীরা সহজ-সরলভাবে সঠিক বাক্য বলতে পারেনা, সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা অসুবিধাজনক হয়।

★ এই পদ্ধতি যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন ।

★ একসঙ্গে অনেকজন শিক্ষার্থীকে পাঠদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশ কষ্টসাধ্য। কারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর না দিলে পাঠদান প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

(১) শব্দানুক্রমিক পদ্ধতি বলতে আপনি কি বোঝেন?

(২) শব্দানুক্রমিক ও বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির মধ্যে কোনটি বর্তমানে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন এবং কেন?

(৩) বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতির দুটি গুরুত্ব লিখুন।

৩.৩.৪. অভিনয় পদ্ধতি ঃ

মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিশুর সহজাত আকর্ষণ বজায় রেখে ছড়া গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে মাতৃভাষা শিক্ষাদান যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। শিশুর এই সহজাত আকর্ষণের পরিধি বিচার করে অভিনয় পদ্ধতিকেও কার্যকরী করা যায়। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সহজেই জীবন পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হই, নানাবিধ আনন্দ মধুর অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে উঠে আসে। এ কারণে অভিনয় আমাদের কাছে প্রিয় এবং শিশুদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

উদ্দেশ্য ঃ

★ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর আগ্রহ সঞ্চার করা।

★ অভিনয় এমন একটা মাধ্যম যা শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ও মনের মধ্যে একটি সমন্বয় সূত্র স্থাপন করে।

★ বিমূর্ত চেতনা সৃষ্টিতে অভিনয় বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে।

★ পাঠ্যবিষয়টিকে সহজে হৃদয়ঙ্গম ও সরলীকরণ করা যায়।

★ অকারণ ব্যাখ্যার দরকার হয় না।

★ শিশুর মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সামাজিকতা প্রভৃতি সুস্থ মানসিক গুণাবলী বিকাশ সাধন করা।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠ্য ‘স্বপন বুড়ো’, ‘সুস্থ শরীর সুস্থ মন’; তৃতীয় শ্রেণিতে পাঠ্য ‘অবাক জলপান’; চতুর্থ শ্রেণিতে পাঠ্য ‘পেটে ও পিঠে’, ‘বড়ো খবর’ পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠ্য ‘ফণিমনসা ও বরের পরি’; সপ্তম শ্রেণিতে পাঠ্য ‘জাদু কাহিনি’ প্রভৃতি পাঠগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে সঞ্চয় করলে শিক্ষার্থীরা তা সহজে আয়ত্ত করতে পারবে।

অভিনয় পদ্ধতির গুরুত্ব ঃ

★ পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নীরস বিষয়গুলি নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করলে নতুন রূপ নিয়ে তা শিশু মনে মুদ্রিত হয়ে যায় যা শিশুরা কখনই ভোলে না।

★ একঘেয়ে ক্লান্তিকর পাঠ বা পাঠ্যাংশ অভিনয় পদ্ধতির মাধ্যমে পড়ালে পাঠ জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং শিশু সাগ্রহে পরোক্ষভাবে অংশ নেয়।

★ অভিনয় করার জন্য পাঠ মুখস্থ করার সময় নির্দিষ্ট অংশটি বারবার পড়তে হয় বক্তব্যে স্পষ্টতা ও উচ্চারণে স্বচ্ছতা জন্মায়।

★ শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কও অনেক মধুর হয়।

অভিনয় পদ্ধতির অসুবিধা ঃ

★ অভিনয় পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া সব পাঠ অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায় না।

★ এই পদ্ধতিতে পাঠদানে সব সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ সম্পূর্ণ করা যায় না।

★ কাহিনি বিন্যাস, পাত্র-পাত্রী, সন্নিবেশ চরিত্রানুযায়ী বক্তব্য সাজানো সঠিক না হলে পদ্ধতিটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৩.৩.৫. অনুকরণ পদ্ধতি ঃ

অনুকরণ প্রবণতা জন্ম নেয় প্রধানত সামাজিক যোগাযোগ ও ধারণা থেকে। তাছাড়া অনুকরণ প্রবণতা শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষালাভ ও সামাজিক কার্য-নির্বাহ হয়। আবার অনুকরণের প্রচেষ্টার উৎকর্ষ সাধনও করা যায়। কারণ পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে অনুকরণ কাজটি আরও উন্নত হয়ে ওঠে। তাই শিশুর অনুকরণ প্রবণতা লক্ষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

ভাষা শিক্ষার প্রধান চারটি দক্ষতা— শ্রবণ, কথন, পঠন ও লিখন। আর এই চারটি স্তম্ভেরই সাফল্য নির্ভর করে অনুকরণ ক্ষমতার উপর। শ্রবণ স্তরে শিশু অন্যের কথা শুনে শুনে কোন কিছু বলার চেষ্টা করে। তাই এক্ষেত্রে অনুকরণ খুবই কার্যকরী পদ্ধতি। আর কথনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু গৃহ পরিবেশ পরিজনের বলা কথা অনুকরণ করেই বলতে শেখে। একটু বড়ো হলে ছড়া, কবিতা, আবৃত্তি ইত্যাদি সবই অন্যের থেকে শুনে তার উচ্চারণ, বলবার ভঙ্গি অনুকরণ করে শিশু তা প্রকাশ করে থাকে। তাই কখন স্তরেও এই পদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্যী। গঠনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি শিশুরা শিক্ষক/শিক্ষিকা বা পরিজনদের কাছে অনুকরণের মাধ্যমে পাঠে অভ্যস্ত হয় এবং যথাযথ উচ্চারণ ভঙ্গি, প্রকাশ ভঙ্গি, যতিচিহ্নের ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

লিখনের ক্ষেত্রেও শিশু প্রথম লিখন কাজটি করে, অনুকরণের মাধ্যমে। শিশু প্রথমে সাধারণত অন্যের লিখে দেওয়া বর্ণের উপর দাগ বুলিয়েই বর্ণ লেখা শেখে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও অনুকরণ পদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অনুকরণ পদ্ধতির গুরুত্ব ঃ

★ অনুকরণ একটি অন্যতম উন্নত মানের শিক্ষাদান পদ্ধতি।

★ অনুকরণ নির্ভুল হলে পাঠে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম থাকে।

★ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণ পদ্ধতির ব্যবহার আবশ্যিক।

★ অনুকরণের মাধ্যমে শিশুরা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশেই শিক্ষালাভ করে থাকে।

অনুকরণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ঃ

★ অনুকরণ প্রবণতাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে ভবিষ্যৎ পাঠের ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়।

★ শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে।

★ মুদ্রাদোষ ও আঞ্চলিকতার প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের উপর।

★ শিক্ষার্থীর নিজস্বতা বা মৌলিকতা নষ্ট হতে পারে।

৩.৩.৬. অনুবন্ধ পদ্ধতি ঃ

একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের যোগসূত্র রচনা করে যে শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে অনুবন্ধ পদ্ধতি বলে। একটি বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় বলে এই পঠন পদ্ধতিকে অনুবন্ধ পদ্ধতি বলা হয়। যেমন বাংলা পাঠদানকালে একই সঙ্গে পরিবেশ পরিচিতির দিক, ভৌগোলিক দিক, ঐতিহাসিক দিক, বিজ্ঞানের দিক বা অঙ্কন ইত্যাদি বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

যেমন— 'আমাদের গ্রাম', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'মধু আনতে বাঘের মুখে', 'আমার মা'র বাপের বাড়ি' ইত্যাদি পাঠ্যাংশগুলি পাঠদানকালে আমরা পরিবেশ পরিচিতিরও পরিচয় দিতে পারি; বোঝাতে পারি ভৌগোলিক পরিবেশের কথা। আবার 'দেশের মাটি', 'এতোয়া মুন্ডার কাহিনী', 'মাস্টারদা', 'বাঘাযতীন' ইত্যাদি পাঠ্য বিষয়গুলি পড়াতে গিয়ে আমরা খুব সহজেই আলোচনা করতে পারি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। এইভাবে আরও অন্যান্য বিষয় পড়ানো যেতে পারে।

অনুবন্ধ পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য ঃ

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ রয়েছে তা বুঝিয়ে দেওয়া। খন্ড খন্ড করে বিষয়গুলি পড়ানো হলেও তাদের মধ্যে অখন্ডতা আছে তা ধরিয়ে দেওয়া।

অন্যতম উদ্দেশ্য-পাঠ্য বিষয়ের চাপ কমানো। এর ফলে বিষয় কমবে না কিন্তু তার ভার কমে যাবে।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিষয় পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে সু-সামঞ্জস্য চিন্তাধারার সৃষ্টি। এই পদ্ধতিতে সেই বিকাশ সম্ভব।

অনুবন্ধ পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ ঃ

(ক) একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ ঃ পূর্ব পাঠের উপর ভিত্তি করেই নতুন পাঠ দেওয়া হয়। যেমন— 'বন আমাদের বন্ধু', 'চায়ের কথা' পাঠদানকালে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

(খ) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ ঃ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকেরা একসাথে বসে আলোচনা করে তাঁদের বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সুযোগ বুঝে শ্রেণি কক্ষে তার বাস্তব প্রয়োগ দেখাতে পারেন।

(গ) পাঠ্যগ্রন্থ ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুবন্ধ ঃ পাঠ্য হিসাবে শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয় শিখছে, তার ব্যবহারিক ক্ষেত্র কোথায় অর্থাৎ বাস্তবে ঐ জ্ঞান কোথায় কাজে লাগানো যাবে তার আলোচনা করা যেতে পারে।

অনুবন্ধ পদ্ধতির গুরুত্ব ঃ

একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন বিষয়গুলি বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর সাপেক্ষ কারণ জ্ঞান যদি অখন্ড হয় তাহলে জ্ঞানের উপকরণগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকবেই। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। তাই পড়াবার সময় উপযুক্ত শিক্ষক স্বতন্ত্রভাবে বিষয় উপস্থাপিত না করে সমজাতীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত করে পাঠ দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে জ্ঞানের অখন্ডতা রক্ষিত হবে এবং বিষয়ের বিভিন্নতা দূর হয়ে একটি সমগ্রতার ধারণা তার মনে গেঁথে যাবে।

অনুবন্ধ পদ্ধতিব প্রয়োগে সতর্কতা ঃ

★ সংযোগ সাধন কাজটি যেন কৃত্রিম বা কষ্টকল্পিত না হয়।

★ মূল বিষয়কে বোঝাতে গিয়ে যতটুকু দরকার ততটুকুই অন্য বিষয়ের সাহায্য নেওয়া হবে।

★ মূল বিষয়ের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কযুক্ত যে সব বিষয় সাবলীলভাবে আনা সম্ভব হবে সেই বিষয়গুলি যোগ-সাধন করতে হবে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়কেন্দ্রিকতা অত্যধিক। ফলে সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অনুবন্ধন স্থাপনের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়।

৩.৩.৭. বিবৃতিমূলক পদ্ধতি ঃ

বিষয়বস্তুকে বোঝানোর জন্য শিক্ষক বিবৃতির সাহায্যে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই বিবৃতির গুণে বিষয়বস্তুর একটা ধারণা শিশুদের সামনে তুলে ধরা হয়। ফলে সেই পাঠ শিশুদের আত্মস্থ করতে সুবিধা হয়। তাছাড়া বিষয়বস্তুর স্পষ্ট ধারণা লাভের ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বিবৃতিমূলক পাঠের গুরুত্ব ঃ

★ পাঠের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে এই পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

★ শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই পাঠের ভূমিকা আছে।

★ এই পদ্ধতি বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে সহায়ক।

★ বিবৃতিমূলক পাঠ শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠে মনোযোগী করে তুলতে উৎসাহিত করে।

★ এই পাঠদানের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর ধারণা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা স্পষ্টতা আসে।

বিবৃতিমূলক পাঠের সীমাবদ্ধতা ঃ

★ বিবৃতিমূলক পাঠে শিশুকেন্দ্রিকতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না।

★ বিবৃতি যদি যথাযথ না হয় তাহলে পাঠদান আকর্ষণহীন হয় এবং শিক্ষার্থীরা পাঠে অমনোযোগী হয়ে ওঠে।

★ বিবৃতিমূলক পাঠে বিবৃতিটি শিক্ষার্থীদের মনের মতো না হলে তা পাঠদানে বাধা সৃষ্টি করে।

★ বিবৃতিমূলক পাঠে বৈচিত্র্যমূলকতা না আনতে পারলে তা একঘেয়েমির সৃষ্টি করে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

(১) অভিনয় পদ্ধতির উদ্দেশ্যগুলি কি কি?

(২) অনুকরণ পদ্ধতির দুটি সীমাবদ্ধতা লিখুন।

(৩) অনুবন্ধ প্রণালীর চারটি উদ্দেশ্য লিখুন।

(৪) বিবৃতিমূলক পদ্ধতি বলতে কি বোঝেন?

৩.৩.৮. আলোচনা পদ্ধতি ঃ

কোন একটা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টামূলক যে কথোপকথন তাকেই বলা হয় আলোচনা। সমাজকৃত শিক্ষার প্রধান অবলম্বনই হল আলোচনা পদ্ধতি। আজকাল শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহন করাকে একটি মূল্যবান রীতি বলে মনে করেন। আলাপ-আলোচনায় শিক্ষার্থী সংকোচ ত্যাগ করে প্রশ্ন করে বা উত্তরের মাধ্যমে তার মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীর জানার কৌতূহল বৃদ্ধি করতে পারেন নানাবিধ প্রশ্ন ও উত্তর দানের মধ্য দিয়ে। নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বক্তব্যের মাধ্যমে কিংবা উত্তর দানের মাধ্যমে সরস করে তোলা যায়। এই আলোচনা সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত, বিতর্ক, সেমিনার, গোল টেবিল বৈঠক প্রভৃতি নানাভাবে হতে পারে।

আলোচনা পদ্ধতির স্তর ঃ

আলোচনা পদ্ধতি তিনটি স্তরে সম্পন্ন করা হয়— (ক) প্রস্তুতি পর্ব (খ) আলোচনা পর্ব (গ) মূল্যায়ন পর্ব

(ক) প্রস্তুতি পর্ব ঃ এই পর্বে শিক্ষকের প্রস্তুতি প্রথমে প্রয়োজন। যে বিষয় আলোচনার জন্য শিক্ষক মহাশয় গ্রহণ করবেন— সে সম্পর্কে তাঁকে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। কোন কোন তথ্যাদি গ্রহণ করা হবে, কোন কোন পুস্তক ব্যবহার করা প্রয়োজন— এসব বিষয়ে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই ভালোভাবে জানতে হবে। সুষ্ঠু আলোচনা পদ্ধতির জন্য এ ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি অতীব প্রয়োজন।

(খ) আলোচনা পর্ব ঃ আলোচনার বিষয় হবে পূর্ব নির্দিষ্ট। শিক্ষক মহাশয় এখানে পরিচালকের ভূমিকা পালন করবেন। তিনি শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করবেন। বিষয়বস্তু যেন অপ্রাসঙ্গিক না হয়, অযথা ভারাক্রান্ত বা বিতর্কিত না হয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(গ) মূল্যায়ন পর্ব ঃ মূল্যায়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে—

★ শিক্ষার্থী কতখানি উপকৃত হল এবং শ্রেণি পাঠ নেওয়ার সময় সে কতটুকু আয়ত্ত করতে পারল।

★ আলোচনা চলাকালে শিক্ষার্থী কী ধরনের মনোভাবের পরিচয় দিল। অন্যের মতামত গ্রহণ করার বা বর্জন করার সময় সে উদার ও সুস্থ মনের পরিচয় দিল কিনা।

★ উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠদান সফল হল কিনা।

আলোচনা পদ্ধতির গুরুত্ব ঃ

★ আলোচনা পদ্ধতিতে আলোচনার সময় ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা আরও ঘনিষ্ঠ হবে। পরস্পরের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল, সংবেদনশীল এবং সহযোগিতাপূর্ণ হবে। আদর্শ সমাজের ভাবী নাগরিক হিসাবে এই গুণগুলির অনুশীলন যে আবশ্যক তা বলাই বাহুল্য।

★ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করে এতে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

★ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। সাধারণত, উভয়ের মধ্যে যে ভীতি ও সংকোচের দূরত্ব থাকে তা ঘুচে যায়।

★ আলোচনার মাধ্যমে পাঠ অগ্রসর হয় বলে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমস্ত দিক পরিপূর্ণভাবে ছাত্রের আয়ত্তে আসে।

★ স্বীকৃত বা অস্বীকৃত তথ্যের মাঝখান থেকে স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সুযোগ থাকে এই পদ্ধতিতে। আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, ব্যাখ্যা প্রদান ও নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থাকে।

আলোচনা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ঃ

★ আলোচনা পদ্ধতিতে প্রচুর সময় লাগে। ফলে পঠন-পাঠন বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না।

★ এই পদ্ধতি যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হয় তবে অকারণ আলোচনা পঠন পাঠনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

★ ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদান শুধুমাত্র আলোচনার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

★ বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণিতে এই পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকর নয়।

৩.৩.৯. প্রকল্প পদ্ধতি ঃ

জন ডিউই তাঁর শিক্ষাদর্শনে একটি নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষ যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং সেই সমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে চলতে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে, সেই হল তার সত্যকার জ্ঞান। অর্থাৎ কোন বাস্তব সমস্যার সক্রিয় সমাধানের মাধ্যমেই আমরা নতুন জ্ঞান অর্জন করি। তাঁর এই বৈপ্লবিক মতবাদের ভিত্তিতেই 'সমস্যা পদ্ধতি' (Problem Method) গড়ে উঠেছে।

পরবর্তীকালে জন ডিউই-এর শিষ্য কিলপ্যাট্রিক ডিউই-এর শিক্ষা-পদ্ধতিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে বাস্তব সমাজের পরিবেশে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা-সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের ভিত্তিতে প্রকল্প পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন। স্টিভেনসন বলেছেন— 'A Project is a problematic act carried to completion in its natural setting.'— এই পদ্ধতিতে যে কাজটি শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে, তা হবে সমস্যামূলক এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে সেই সমস্যার সমাধান করবে।

প্রকল্প পদ্ধতির স্তর ঃ

প্রকল্প পদ্ধতিতে চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে—

(ক) উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Purposing) : যে কোন পাঠের কি উদ্দেশ্য হবে তা নির্ধারণ করা।

(খ) পরিকল্পনা (Planning) : উদ্দেশ্য স্থির করে নেবার পর চিন্তা করতে হবে কিভাবে সেই প্রকল্পটি কাজে রূপায়িত করা যায়। এই স্তরে প্রজেক্টের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি রচনা করতে হয়। প্রজেক্ট বড় হলে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ভাগ কজন মিলে করবে, কে-কতটা করবে, এইসব স্থির করা হল পরিকল্পনা স্তরের কাজ।

(গ) সম্পাদন (Execution) : এই স্তরে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করা হয়।

(ঘ) বিচার করণ (Judging) : কর্মটি সম্পাদনের পর সেটা কতটা সফল হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি শুরু করা হয়েছিল, তা সিদ্ধ হয়েছে কিনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি কী হল, কী শিক্ষা হল, সে সম্পর্কে সবাই মিলে বিচার করে দেখবে।

শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

উপরোক্ত চারটি স্তর রূপায়নের সময় শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক মহাশয় প্রকল্প নির্বাচনে, পরিকল্পনা রূপায়ণে এবং বিচার করণে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দেবেন এবং প্রত্যেককে কাজে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক নিজেও কাজে অংশগ্রহণ করবেন কিন্তু শিক্ষার্থীদের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করবেন না। তাছাড়া প্রকল্পের অভিজ্ঞতাকে পরবর্তীকালে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষার্থীদের তিনি সাহায্য করবেন।

প্রকল্পের প্রকারভেদ ঃ

কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্টকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—

(ক) সংগঠনমূলক প্রজেক্ট— এর লক্ষ্য হল কোন কিছু সৃষ্টি করা বা গড়ে তোলা। যেমন— বাগান করা, অভিনয় করা।

(খ) উপযোগমূলক প্রজেক্ট যেমন— গল্প শোনা, কবিতা পাঠ, গান উপভোগ করা, চিত্রপটের সৌন্দর্য্য বিচার করা ইত্যাদি।

(গ) সমস্যামূলক প্রজেক্ট— এর লক্ষ্য কোনো সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা। যেমন—চতুর্থ শ্রেণিতে পাঠ্য 'আলো' নাটকটি গল্পের আকারে লিখতে বলা যেতে পারে।

(ঘ) শিক্ষামূলক প্রজেক্ট— এখানে লক্ষ্য হল কোন বিষয়ে জ্ঞান বা নৈপুণ্য অর্জন করা। যেমন— অঙ্ক করা, মোটর চালাতে শেখা ইত্যাদি।

প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা ঃ

★ মনোবিজ্ঞানসম্মত সক্রিয়তা তত্ত্বের উপর পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত। নানা কাজের মধ্য দিয়ে হাতে কলমে শেখার কাজটি হয় বলে শেখাটা ছাত্রের মনে বাস্তবরূপ নিয়ে সার্থক হয়।

★ বিভিন্ন কাজের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়।

★ শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার শেখে এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

★ শিক্ষার্থীরা শ্রেণি পাঠের এক ঘেয়েমি থেকে মুক্ত হয়।

★ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। আত্মনির্ভরশীলতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

★ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়।

★ শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতা, দলপ্রীতি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের বিকাশ ঘটে।

★ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত ও প্রীতিপূর্ণ হয়।

প্রকল্প পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ঃ

★ সমগ্র পাঠক্রমটি প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে শেখানো যায় না, ফলে শেখার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায়।

★ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শেখা হল খন্ডিত বা আংশিক, সেগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে না।

★ প্রতিটি প্রকল্প রচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কাজ করার প্রয়োজন হয় তাতে প্রচুর সময় ও শ্রমের প্রয়োজন।

★ পদ্ধতিটি কার্যকর করে তুলতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। এরূপ অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা স্বল্প।

★ এখানে লক্ষ্য হল অনুভূতির যথাযথ প্রয়োগ।

★ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার চেয়ে দলগত উৎকর্ষতার পরিমাপে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

চতুর্থ শ্রেণির উপযুক্ত 'চায়ের কথা', 'টেলিভিশন', তৃতীয় শ্রেণির উপযুক্ত 'মধু আনতে বাঘের মুখে' 'বুনো হাঁস' গদ্যাংশগুলি পাঠদানকালে প্রকল্প পদ্ধতির ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৩.১০. ছড়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ

ছড়া হল শিশুদেবতার প্রতি মাতৃহৃদয়ের স্বতোৎসারিত স্তবনাম। শিশু নতুন হলেও চির পুরাতন; বার বার যে একই রূপে আবির্ভূত হয় মায়ের কালে। এই ছড়াগুলিও তেমনি যেন দেশকাল নির্বিশেষে বারবার ফিরে আসে মায়ের মুখে। রবীন্দ্রনাথের মতে ছড়াগুলি হচ্ছে বাল্যের মাধুর্য রসের আদিম অভিব্যক্তি। তাদের মধ্যে আছে এক চিরত্ব। তাই সব দেশের সবকালের শিশুর কাছে এর আকর্ষণ।

ছড়ার শ্রেণিবিভাগ ঃ

বাংলা ভাষায় অসংখ্য ছড়া দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে। তার সামান্য কিছু অংশ সংগৃহীত হয়েছে। এই সংগৃহীত ছড়াগুলোকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

যেমন—

(১) ঘুমপাড়ানী ছড়া— 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো...........' ইত্যাদি

(২) শিশুদেবতার স্তবনাম জাতীয় ছড়া— 'খোকন মোদের সোনা..........' ইত্যাদি

(৩) প্রকৃতি চিত্র ছড়া— 'লেবুর পাতায় করমচা.......' ইত্যাদি

(৪) খেলাভিত্তিক ছড়া— 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে........' ইত্যাদি

(৫) চিত্রকল্প এবং অর্থহীন ঝঙ্কার বহুল ছড়া— হাট্টিমা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম......ইত্যাদি।

আমরা জানি যে শিশুর সহজাত প্রবণতা থাকে ছড়া শোনা ও ছড়া বলার প্রতি। কারণ ছড়ার ছন্দ-তাল-লয়-সুর-ছবি সহজেই শিশুর মনে দাগ কেটে যায়। ছড়া শিশুর মনে অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার করে। দেখা যায় শিশু পড়তে শেখার আগেই গৃহ পরিবেশ থেকে শিখে বিভিন্ন ছড়া বলে থাকে। বলা যায় ছড়া শিশুর প্রথম বাক্য ও প্রথম আবৃত্তি। ছড়া বলতে বলতে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। ছড়ার এই কার্যকারিতা লক্ষ্য করে ছড়া বলার মাধ্যমে নির্ভুল বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণের অভ্যাস গঠন করতে পারা যায়।

ছড়া শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

★ বাকশক্তি ও উচ্চারণের জড়তা দূর হয়।

★ শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

★ দলগত আবৃত্তির মাধ্যমে শিশুর লজ্জা ও ভীরুতা দূর হয়।

★ শ্রুতিমধুর ছড়া আবৃত্তি করে শিশু প্রচুর আনন্দলাভ করে।

★ ছড়া আবৃত্তির মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন ও আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

★ শিশুমনে অজ্ঞাতসারে সাহিত্য রসবোধ সৃষ্টি করে।

ছড়া শিখন পদ্ধতি ঃ

★ উচ্চারণের অঙ্গভঙ্গি এবং ছন্দ অনুযায়ী যথার্থ সরব পাঠ করতে হবে।

★ ছড়াগুলি শিশু শুনে শুনে মুখস্থ করে তাই কখনো টুকরো করে ছড়া পাঠ করা যাবে না, পুরোটাই বার বার বলতে হবে।

★ সমবেত পাঠের মাধ্যমে অনিচ্ছুক, ভীরু, মুখচোরা শিশুরা যাতে তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে।

★ ছড়ার বিষয়বস্তু অনুসারে রঙীন চিত্রের অনুষঙ্গ রাখলে শিখন দ্রুততর ও আনন্দদায়ক হয়।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

(১) আলোচনা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাগুলি লিখুন।

(২) প্রকল্প পদ্ধতির স্তরগুলি কি কি?

(৩) ছড়া শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি কী?

৩.৪. সারসংক্ষেপ ঃ আলোচ্য বিভিন্ন শিখন পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন স্তরে আলাদা আলাদাভাবে উপযোগী। যেমন— শব্দানুক্রমিক বা বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি মূলত প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে উপযোগী। আবার আলোচনা পদ্ধতি বা প্রকল্প পদ্ধতি চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য বিশেষ উপযোগী। তবে অনুবন্ধ পদ্ধতিটি যে কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। আসলে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি নয় প্রতিটি পদ্ধতির সমন্বয়নে যে পদ্ধতির উদ্ভব হয় সেটাই কার্যকর পদ্ধতি; যেটা বাস্তব শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা হয়। প্রতিটি শিক্ষণ পদ্ধতিরই কিছু গুরুত্ব যেমন আছে, তেমনি আছে কিছু সীমাবদ্ধতা। বাংলা ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষণ পদ্ধতি যে শিশুকেন্দ্রিকতার নিরিখে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হবে তা বলাই বাহুল্য।

৩.৫ অনুশীলনী ঃ

সঠিক উত্তরটির পাশে (√) চিহ্ন দিন ঃ

(১) শব্দানুক্রমিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে—

(ক) সহজ সরল শব্দ চয়ন করা উচিত (খ) অপরিচিত শব্দ চয়ন করা উচিত

(গ) বিদেশী শব্দ গ্রহণ করা উচিত (ঘ) যুক্তব্যঞ্জন বিশিষ্ট শব্দ চয়ন করা উচিত

(২) শিক্ষককে অনুকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে কারণ

(ক) অনুকরণ একটি অন্যতম উন্নত মানের শিক্ষাদান পদ্ধতি

(খ) অনুকরণ পদ্ধতি প্রয়োজনহীন

(গ) অনুকরণের মাধ্যমে শিশুরা কিছুই শেখে না

(ঘ) অনুকরণ পদ্ধতি অপ্রচলিত।

(৩) অনুবন্ধ প্রণালীতে—

(ক) দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়

(খ) একটি নির্দিষ্ট ভাবের সঙ্গে সংগতি সাধন করা হয়

(গ) দুটি বিষয়ের দুটি ভাবের সঙ্গে সংগতি সাধন করা হয়

(ঘ) দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ভাবের সঙ্গে সংগতি সাধন করা হয়

(৪) প্রকল্প পদ্ধতির উদ্ভাবক—

(ক) জন ডিউই (খ) কিলপ্যাটিক (গ) রুশো (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫) আলোচনা পদ্ধতির কয়টি স্তর—

(ক) ৪টি (খ) ৫টি (গ) ৩টি (ঘ) ২টি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) বিবৃতিমূলক পাঠ কি?

(২) আলোচনা পদ্ধতির দুটি গুরুত্ব লিখুন।

(৩) বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি বলতে কি বোঝেন?

(৪) ছড়া কাকে বলে?

(৫) অভিনয় পদ্ধতির ২টি গুরুত্ব লিখুন।

(৬) প্রকল্প পদ্ধতি কি?

সংক্ষিপ্ত ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) শব্দানুক্রমিক, বর্ণানুক্রমিক ও বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(২) উদাহরণসহ অনুবন্ধ প্রণালীটি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) ছড়া শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি লিখুন।

(৪) আলোচনা পদ্ধতি কি? এই পদ্ধতি কি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি— যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

(৫) অনুকরণের মাধ্যমে শিশুরা কিভাবে শেখে তা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

অধ্যায়

৪

বাংলা ভাষা শিখন শিক্ষণে দক্ষতাবলীর বিকাশ

৪.১. সূচনা

মানুষের অন্তরের ভাব জগৎ আর বাইরের বস্তু জগৎ— এই দুইয়ের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হল ভাষা। সামাজিক মানুষ একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে ভাষার মাধ্যমে। এই ভাষা সে সংগ্রহ করে আলো, বাতাস ও জলের মতই একান্ত স্বাভাবিকভাবে ও অজ্ঞাতসারে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই শিশুর ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। এরপর সমগ্র বাল্য ও কৈশোর কাল ধরে সে ভাষা শিক্ষার কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে ভাষা ব্যবহারে দক্ষ হয়ে ওঠে। এই ভাষা ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার জন্য তাকে নানাভাবে শিক্ষা দিতে হয়।

শিক্ষার্থীদের চাহিদা, রুচি, সামর্থ্য ও গ্রহণ ক্ষমতার কথা বিচার করে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর ভাষা শিক্ষা দক্ষতার দুটি ভাগ— (১) গ্রহনধর্মী দক্ষতা (শ্রবণ, পঠন) (২) প্রকাশধর্মী দক্ষতা (কথন, লিখন)। এই ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা শব্দভান্ডারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিশুরা দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে এবং তার শব্দ ভান্ডার বিকশিত হয়।

৪.২. উদ্দেশ্য ঃ

★ ভাষা শিক্ষনের বিভিন্ন দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা গঠন।
★ হস্তলিপি সম্পর্কে ধারণা গঠন।
★ বাংলা শব্দ ভান্ডারের বৈচিত্র্য অনুধাবন।
★ ভাষা শিক্ষায় শব্দ ভান্ডারের গুরুত্ব অবগতি।
★ সৃজনাত্মক লিখনের বিকাশ কিভাবে সম্ভব সে সম্পর্কে ধারণা গঠন।

বিষয়বস্তুর ধারণা ঃ

৪.৩.১. শ্রবণ ঃ

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শোনার গুরুত্ব অপরিসীম। এই শোনাই ভাষা শিক্ষার প্রথম শর্ত। শিশু যা শোনে তাই শেখে। কিন্তু ছোট শিশুর বাগ্‌যন্ত্র আর শ্রবণযন্ত্র দুটোই পৃথিবীতে নবাগত, তাই আমাদের বয়স্কদের কথা বলার ভঙ্গিটুকু শিশু তার অনভ্যস্ত শ্রবণ যন্ত্র দিয়ে ঠিক ধরতে পারে না। ফলে তার শুনে শেখার মধ্যে কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কর্তব্য শিশুর এই ত্রুটি সংশোধনের দিকে নজর দেওয়া।

শিক্ষার্থী শোনার দক্ষতা কতটা অর্জন করছে তা জানার জন্য শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখবেন—

★ অনেক কথা শোনার পর শিশু তার মর্মার্থ বলতে পারে কিনা
★ শ্রুত বিষয়গুলি মনে রাখতে পারে কিনা
★ শ্রুত বিষয়গুলি মনে রেখে সঠিক উত্তর বলতে পারে কিনা
★ বিষয়টি অনুপুঙ্খভাবে মনে রাখতে পারে কিনা
★ নিজের বলার সময় আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রাখতে পারে কিনা
★ অন্যের কথা শোনার সময় মনোযোগী থাকে কিনা
★ ব্যবহৃত শব্দগুলির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে কিনা
★ শব্দগুলিকে শুনে যথাযথভাবে অনুকরণ করতে পারে কিনা

পড়াশুনার ক্ষেত্রে শোনার গুরুত্ব অপরিসীম। সহজ পাঠ প্রথম ভাগে বর্ণপরিচয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়—

অ, আ

'ছোটো খোকা বলে অ, আ
শেখেনি সে কথা কওয়া।'

এই শ্রবণগ্রাহ্য বা শ্রুতিমধুর ছড়া দিয়ে বর্ণ পরিচয় করানোর প্রয়াস লক্ষ করার মতো। শব্দের সাথে পরিচয় কিংবা বর্ণপরিচয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় প্রথমে শব্দ বা বর্ণকে সশব্দে উচ্চারণ করেন। শিশু তা শোনে এবং পর মুহূর্তেই বলে 'অ'; 'আ'। শিক্ষকের উচ্চারিত 'অ', 'আ' শ্রবণের সাথে সাথে পুস্তকে লেখা 'অ', 'আ' একাত্ম হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুর 'অ', 'আ' বর্ণগুলির সাথে পরিচয় ঘটে।

জন্মের সাথে সাথেই শিশু ভাষা জ্ঞান নিয়ে আসে না। কিছু অব্যক্ত শব্দ করা ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। মানব শিশু মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে কান্নার শব্দে তার আগমন বার্তা ঘোষণা করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে মা, বাবা, দাদা, দিদি প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে শুনে ভাষা শেখা শুরু করে। তবে শৈশব স্তরে তার বলা শব্দগুলো পরিপূর্ণ রূপ পায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়।

৪.৩.২. কথন

ভাষা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ 'কথন'। কথোপকথন বা কথাবার্তা আসলে কী? বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় এর প্রথম উদ্দেশ্য হল শিশু নিজের ভাবনা স্পষ্ট, সরল, শ্রুতি মধুর শব্দে বলতে পারবে। দ্বিতীয়ত কখন কথা বলতে হয় অথবা কথা বলার স্থান, কাল, সময় শিশু বোঝে কিনা। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী বলতে পারা। তৃতীয়ত তর্কপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করা বা বলতে পারা। চতুর্থত শিশুকে সফল বক্তা হতে তালিম দেওয়া। পঞ্চমত ভাষাশৈলী বা রীতি (Style) আয়ত্ত করা।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রমাণ করেছেন,— মাতৃভাষা বলতে শিখলে লেখা ও পড়ার কাজটি তাড়াতাড়ি শেখা যায়। এর জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজনীয়। যথা—

প্রারম্ভিক প্রস্তুতি ঃ শিশু বিদ্যালয়ে আসার সময় প্রায় দেড় দু-হাজার শব্দ আয়ত্ত করে আসে। তা সত্ত্বেও 'কথন শক্তি' বিকাশে শিক্ষক মহাশয় সচেতন থাকবেন। বিশেষত শিক্ষক নজর দেবেন— (১) শিশু যেন স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে। (২) শিশুর কথা বলার ভঙ্গি যেন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয় (৩) বক্তব্য বিষয় অর্থবোধক হয় এবং (৪) নতুন নতুন শব্দ বাক্যে প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুর ভাষা দক্ষ হয়ে ওঠে।

পরিবেশ ঃ শিশু যে পরিবেশ থেকে আসে সেই পরিবেশের প্রভাব থাকে তার কথন রীতির মধ্যে। শিশুর প্রাক লিখন ও পঠন স্তরে এইসব পরিবেশগত ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। অর্থাৎ পরিবেশ বা আঞ্চলিকতার প্রভাবমুক্ত করে 'কথন' বিকাশে শিশুদের যথার্থ উচ্চারণ ভঙ্গি শেখাতে হবে। যদিও তার নিজস্ব উপভাষার প্রতি কখনও অশ্রদ্ধা প্রদান করা যাবে না।

প্রয়োগগত দিক ঃ বিদ্যালয়ে শিশুকে বলার সুযোগ করে দিতে হবে। প্রথম শ্রেণির বইতে দেখা যায় ছড়ার প্রাধান্য। তাই শিশু এক্ষেত্রে ছড়া শুনবে ও আবৃত্তি করবে। গল্প শুনবে এবং বলার চেষ্টা করবে।

কথন দক্ষতার ত্রুটিঃ

(১) নাকি সুরে কথা বলা ঃ এটা শারীরিক কারণে হতে পারে আবার অনেক সময় অভ্যাসবশতও হয়।

(২) তোতলানো ঃ বাচনের এই ত্রুটি যার থাকে সে কোনো কথাই সম্পূর্ণভাবে বলতে পারে না। ধীরে ধীরে কথা বলার মধ্য দিয়ে এই দোষ দূর করা যেতে পারে।

(৩) হীনমন্যতা ঃ আত্মবিশ্বাসের অভাবে এই দোষ দেখা দেয় এবং কথাবার্তার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে।

(৪) লাজুকতা ঃ লাজুকতা ও কথাবার্তার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

(৫) মুদ্রাদোষ ঃ একই শব্দ বা বাক্যাংশ বারবার বলা বা হাত-পা নাড়ানো, অব্যক্ত শব্দ ইত্যাদি এক এক ধরনের মুদ্রাদোষ।

(৬) অতি দ্রুত বা খুব ধীরে কথা বলা ঃ অনেক সময় খুব দ্রুত কথা বলতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উচ্চারণগত ভুল-ত্রুটি করে থাকে। আবার আরো ধীরে ধীরে কথা বলতে গিয়েও এই ধরনের দোষ ঘটে।

(৭) আঞ্চলিকতা ঃ শিক্ষার্থীদের কথনে অঞ্চলের বাচনভঙ্গির প্রভাব পড়ে, শিক্ষক তা দূর করতে সচেষ্ট হবেন।

সমস্যা সমাধান ঃ

কথন দক্ষতার বিভিন্ন ত্রুটি দূর করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। যথা—

(ক) সরব পাঠ ঃ শ্রেণিকক্ষে সরব পাঠকালে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ যথাযথ হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে।

(খ) প্রার্থনা সভা ঃ বাণী পাঠ, প্রয়োজনীয় ঘোষণা, একক বা সমবেত সংগীত-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কথন দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

(গ) আলোচনা ঃ আলাপ-আলোচনাকালে কোন শিক্ষার্থী আঞ্চলিক বা কোন অপ্রাসঙ্গিক শব্দ ব্যবহার করলে তা শিক্ষক সংশোধন করে দেবেন।

(ঘ) কথোপকথন ঃ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মুখের ভাষার ভুল চিহ্নিত করে শুদ্ধরূপ শেখাতে হবে।

(ঙ) সাধু ও চলিত রীতির ব্যবহার ঃ কথা বলার সময় যাতে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ না ঘটে তা শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

(১) শ্রবণ দক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের দুটি ভূমিকা লিখুন।

(২) 'কথন' বলতে কী বোঝেন?

(৩) 'কথন' দক্ষতা জনিত চারটি ত্রুটির উল্লেখ করুন।

৪.৩.৩. পঠন ঃ

শুনে শেখার পরের স্তর হল পড়া। পড়া দু'ধরনের— সরব পাঠ ও নীরব পাঠ। অক্ষর পরিচয় হবার পর শিশু শব্দ ও বাক্য পড়তে শেখে। পাঠ কৌশল আয়ত্ত করাই হল প্রাথমিক অভিপ্রায়। তারপর হবে ভাষার পাঠ এবং সব শেষে সাহিত্য শিক্ষার পাঠ।

প্রাথমিক স্তরে পঠনের উদ্দেশ্য ঃ

★ অক্ষর পরিচয়ের অনুশীলন

★ প্রত্যেকটি বর্ণের শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ

★ বাক্য ও অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত শব্দাবলীর জ্ঞান ও ধারণা

★ বাক্যের বোধ ও প্রয়োগ দক্ষতা

★ পঠিত বিষয়টি অনুধাবন করতে পারা

★ যতি চিহ্নের অনুসরণ করে পড়তে পারা

★ পাঠ্য বিষয়ের ভাব ও অর্থ উপলব্ধি করা

★ প্রয়োজনে পঠিত বিষয় গুছিয়ে বলতে পারা

★ স্বর-গ্রামের উচ্চতা-নীচতা রক্ষা করে বিষয়টি শ্রোতার মনে মুদ্রিত করে দিতে পারা

★ যথা সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে পাঠ করতে পারা

পাঠের প্রকারভেদ ঃ

পঠন দু'প্রকার— (ক) সরব পাঠ (খ) নীরব পাঠ

(ক) সরব পাঠ ঃ স্বরের সহিত-পাঠ অর্থাৎ জোরে জোরে পাঠ করাকে বলে সরব পাঠ।

সরব পাঠের উদ্দেশ্য ঃ

★ অক্ষরের নিরিখে অনুশীলন

★ প্রত্যেকটি অক্ষরের সুষ্ঠু উচ্চারণ

★ কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

★ আঞ্চলিক মুদ্রাদোষগুলিকে সংশোধন করে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ

★ পারিবারিক প্রভাবে বা আঞ্চলিকতা দোষে যে উচ্চারণের ত্রুটি ঘটে তা সংশোধন

সরব পাঠের প্রয়োজনীয়তা ঃ

★ সরব পাঠ বর্ণ ও শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে সাহায্য করে।

★ অক্ষর পরিচয়ের অনুশীলন ও সুষ্ঠু উচ্চারণের দ্বারা শিশুর শব্দভাণ্ডার যেমন বাড়তে থাকে তেমনি সত্যকার উচ্চারণ শিক্ষাও হয়ে থাকে।

★ সরব পাঠ শিশুদের প্রাণবন্ত করে তোলে এবং এটি শিশু প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

★ পাঠকে শ্রুতিমধুর করার জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ভঙ্গীটি রপ্ত করানো যায় কারণ শিশুকালে শিশুর বাগযন্ত্র নমনীয় ও পরিবর্তনক্ষম থাকে। তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণের এটাই সময়।

★ শিশুদের বদ অভ্যাসের ফলে যে বিকৃতি ঘটে— তোতলামি, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়া, খুব টেনে কথা বলা ইত্যাদি। এগুলিকে যত্ন, স্নেহ, সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষক ধৈর্য্য ধরে সরব পাঠের অনুশীলন দ্বারা দূর করতে পারেন।

সরব পাঠের অসুবিধা ঃ

★ সরব পাঠের জন্য বেশি সময়ের প্রয়োজন।

★ দীর্ঘ সময় ধরে সরব পাঠে মানসিক ক্লান্তি আসে।

★ সরব পাঠে অনেক সময় মনসংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

★ কিছু বিষয় যেমন— গল্প, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল বিষয় যা সরব পাঠে মোটেই উপলব্ধি হয় না।

★ অন্যের পড়াশোনা, চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

নীরব পাঠ ঃ

যে পাঠে কোন রব বা ধ্বনি উৎপাদিত হয় না তাকেই নীরব পাঠ বলে।

নীরব পাঠের প্রয়োজনীয়তা ঃ

★ দীর্ঘকালীন পাঠে সরব পাঠের চেয়ে নীরব পাঠই শ্রেয়। কারণ এতে শিশু সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

★ পাঠ্যবস্তুর রস আস্বাদন করতে হলে নীরব পাঠ আবশ্যক।

★ অনেক ছাত্র যখন একসঙ্গে পড়াশোনা করে তখন নীরব পাঠ প্রয়োজন।

★ পঠনে দ্রুততা আনার জন্য নীরব পাঠ অভ্যাস করা উচিত।

★ প্রবন্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক রচনা নীরব পাঠের দ্বারা অধিগত হয়।

★ নীরব পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠককে বিষয়বস্তুর প্রতি চিন্তা করতে সাহায্য করে।

★ বৃহত্তর জীবনে নীরব পাঠই শ্রেষ্ঠ পাঠ।

নীরব পাঠের ত্রুটি ঃ

★ প্রাথমিক স্তরে শিশু স্বভাব চঞ্চল বলে নীরব পাঠে মন দিতে পারে না।

★ নীরব পাঠের মাধ্যমে পঠনের ত্রুটি সংশোধন হয় না।

★ নীরব পাঠে কবিতা বা অভিনয়ের রস পাওয়া যায় না।

★ নীরব পাঠে চোখ বইতে থাকলেও মন নানা অলস চিন্তায় ঘুরে বেড়ায়।

পদ্ধতিগত দিক দিয়ে যেমন পাঠকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় তেমনি পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পাঠকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) ধারণা পাঠ

(খ) চর্বনা পাঠ

(গ) স্বাদনা পাঠ

(ক) ধারণা পাঠ ঃ কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পেতে হলে যে ধরনের পাঠের প্রয়োজন হয়, তাকেই ধারণা পাঠ বলে। অনেকে আবার একে আয়ত্তীকরণ পাঠও বলে। যেমন— সংবাদপত্র পাঠ।

(খ) চর্বনা পাঠ ঃ যখন কোনো কঠিন বিষয়বস্তুকে বিচার বিশ্লেষণ করে অন্তর্নিহিত অর্থ পাওয়া যায়— তখন সেই পাঠকে চর্বনা পাঠ বলে। যে সমস্ত রচনায় বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে চর্বনা পাঠ প্রয়োজন। যেমন—প্রবন্ধ পাঠ।

(গ) স্বাদনা পাঠ ঃ গভীর ভাব উপলব্ধি করা এবং ভাব সৌন্দর্য বিচারের জন্য যে পাঠ তাই হল স্বাদনা পাঠ। যেমন—কবিতা পাঠ।

আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য ঃ

সাধারণভাবে আদর্শ পাঠের চারটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে—

(১) নির্ভুলতা ঃ নির্ভুল ও সঠিকভাবে পাঠ করতে হবে।

(২) গতি ঃ পাঠে যথাযথ গতি বজায় রাখতে হবে।

(৩) উপলব্ধি ঃ কোন বিষয়বস্তু পাঠ করে তাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য।

(৪) অভিব্যক্তি ঃ কাব্য সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে যে অনুভূতি ও উপলব্ধি ঘটে, বিশেষ করে সরব পাঠের মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি ঘটে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

(১) পাঠের প্রধান চারটি উদ্দেশ্য লিখুন।

(২) আদর্শপাঠের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) সরব পাঠ ও নীরব পাঠের দুটি পার্থক্য লিখুন।

৪.৩.৪. লিখন

শিশু মাতৃভাষা বলতে শেখে অজ্ঞাতসারে, কিন্তু তাকে লিখতে পরিশ্রম করতে হয়। কারণ লিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিশেষ লেখার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে চোখ, হাত এবং মস্তিষ্কের সংযোগ দরকার। হাতের লেখার মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও মনের গঠনের পরিচয় ফুটে ওঠে।

লিখনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

★ ভাষা শিক্ষার সর্বোচ্চ ধাপ লিখনের দক্ষতা অর্জন।

★ আমরা যখন লিখি তখন সেই চিহ্ন বা প্রতীকগুলি পাঠকের মনে অনুরূপভাব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

★ মানুষের মনের আবেগ লেখার মাধ্যমেই সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিক রূপ গ্রহণ করে থাকে।

★ সুন্দর হস্তাক্ষর হল লেখকের রুচিবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ ও শিল্পবোধের পরিচায়ক।

★ লেখার ফলেই মানুষের চিন্তাগুলি সুসম্পূর্ণতা লাভ করে।

শিশুর লিখন বৈশিষ্ট্য ঃ

★ শিশু যখন প্রথম লিখতে শুরু করে তখন বর্ণের সকল অংশে চাপ সমান থাকে না। ফলে লেখাগুলি ছন্দহীন ও অসমান হয়ে পড়ে।

★ শিশু প্রত্যেক বর্ণটিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখে। তাই বর্ণের প্রত্যেক অংশের প্রতি তার অখন্ড মনোযোগ, প্রত্যেক অংশটি যে সমান জোরে লিখতে চায়— এর ফলে শব্দের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না।

লিখন শেখার সময় শিক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রতি সতর্কতা ঃ

★ লেখা শিক্ষার সময় শিক্ষার্থীর বসার ভঙ্গী

★ যথাযথ লিখন সামগ্রী

★ কলম বা পেনসিল ধরার কৌশল

★ সু-ছাঁদের গোটা গোটা অক্ষর বা অক্ষর লালিত্য

★ লিখনের মাধ্যমে মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশিত করা

প্রস্তুতি ও পদ্ধতি ঃ

প্রথমে শিশু যখন লিখতে শুরু করে তখন লেখার বিশুদ্ধি বা সৌন্দর্যের দিকে ততটা গুরুত্ব না দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে যাতে পেশী চালনা করতে শেখে সেদিকেই বেশি নজর দিতে হবে। শিশুকে প্রথমে খেয়ালখুশি মতো হিজিবিজি আঁকতে দিতে হবে। এতে তার আঙ্গুলের পেশীগুলো নমনীয় ও বলিষ্ঠ হবে। অক্ষরের দৃশ্যরূপের সঙ্গে শিশুর পরিচয় না হলে সেই অক্ষরকে চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য ঐ হিজিবিজি রেখাগুলির মাধ্যমেই অক্ষর লিখনের কৌশল শিক্ষককেই শিখিয়ে দিতে হবে। যেমন—

(১) 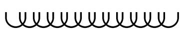 (৩)

(২) <<<<<<<<<< (ব)

(৩) (ল)

একদিকে শিশু ছবি আঁকা, খেলা ও নানাবিধ কাজের মাধ্যমে পড়ছে শিখছে অন্যদিকে সে বর্ণমালার আকৃতিও অঙ্কন করছে। প্রথমে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেবার জন্য সম-আকৃতির অক্ষরগুলো আঁকতে বা লিখতে শেখাতে হবে। যেমন— ত, অ, আ, ব, র, ক, ধ, ঝ ইত্যাদি। এর ফলে পেশীগুলি সক্রিয় ও নমনীয় হবে এবং অনুরূপ অক্ষরগুলি লিখতে শিখবে। নকসা এঁকে শিশুকে রঙীন চক দিয়ে শিক্ষক তা ভরাট করতে দেবেন। ভরাট করায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিশু নিজে থেকেই নানা আকারের নকসা আঁকতে পারবে। এই ভাবে ধীরে ধীরে শিশু লিখনে দক্ষ হয়ে উঠবে।

আদর্শ হস্তাক্ষর/লিখনের বৈশিষ্ট্য ঃ

★ অক্ষরগুলি সমান আকারের হবে

★ অক্ষরের মাত্রাগুলি সব সময় এক রেখায় থাকবে

★ তাদের মধ্যে ব্যবধান সমান হবে

★ অক্ষরগুলো হবে সোজা, বামে বা ডানে হেলানো হবে না

★ শব্দের অক্ষরগুলি হবে কাছাকাছি

★ বিভিন্ন শব্দের মাঝে একটু করে ফাঁকা স্থান দিতে হবে এবং সেইভাবে প্রতি শব্দ ও বাক্যের মধ্যেকার দূরত্ব হবে সমান

হাতের লেখা অভ্যাসের জন্য প্রয়োজন ঃ

(১) বেগ বা গতি

(২) দৃঢ়তা

(৩) যত্ন আর অধ্যবসায়

অনুলিখন ঃ

অনুকরণ করে লিখনের নামই অনুলিখন। অনুলিখনের মাধ্যমে বার বার অনুশীলন করে হাতের লেখার মানকে উন্নত করা যায়।

অনুলিখনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

★ প্রথম শ্রেণি থেকে বর্ণ লেখা শুরু হয় অনুলিখনের মাধ্যমে। অনুশীলনের বিভিন্ন স্তরে (হাত বুলানো, দাগ বুলানো, ভরাট করা ইত্যাদি) অতিক্রম করে শিশু ক্রমশ বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণ লিখতে শেখে।

★ বর্ণের নির্ভুলতা বজায় রাখার জন্য মাত্রাহীন ও মাত্রাযুক্ত বর্ণগুলি অনুলিখনের মাধ্যমেই শেখে।

★ অনুলিখনের মাধ্যমেই বর্ণের মধ্যেকার ফাঁক, বিশিষ্ট শব্দ ও পাশাপাশি শব্দের মধ্যেকার ফাঁক, বিশিষ্ট বাক্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়।

★ ভাষা শিক্ষার ধাপগুলি অর্থাৎ বর্ণ, শব্দ ও বাক্য চিনতে ও লিখতে শেখানো হয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে। সমস্ত কাজটি হয় অনুকরণে বা অনুসরণের মাধ্যমে। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুকরণ বা অনুসরণে লিখতে শেখাতে হয়।

★ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে 'আদর্শ লিপি' রেখে অনুলিপি শেখানো যেতে পারে।

★ অনুলিখনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল— হস্তাক্ষর সুন্দর, সহজ, সাবলীল করা।

শ্রুতি লিখন ঃ

শ্রুতি লিখন হল শুনে শুনে লেখা। অনুলিপির অভ্যাস একটু অগ্রসর হলেই শ্রুতিলিপির সাহায্যে লিখনে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। অক্ষর অবয়ব সম্বন্ধে ধারণা হওয়ার পর তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণিতে শ্রুতিলিখন দেওয়া যেতে পারে।

শ্রুতিলিপির বিষয় ঃ

★ যে অংশটি শ্রুতিলিপি হিসাবে দেওয়া হবে শিক্ষক মহাশয় সেটি সাবধানতার সঙ্গে বেছে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও পাঠটি প্রস্তুত করে নিতে পারবেন।

★ অতি কঠিন বা অতি সহজ বিষয় দেওয়া যাবে না।

★ ছাত্রদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্তু নির্বাচিত হবে।

★ শিশুকে সরব পাঠ অতি দ্রুত বা অতি ধীর যেন না হয়।

★ লেখানোর আগে বলার ভঙ্গী ও কলম বা পেনসিল ধরার কৌশল সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করে দিয়ে শিক্ষক প্রস্তুত হতে সময় দেবেন।

★ শ্রুতিলিপি দেওয়ার সময় শিক্ষক ছন্দ, গতি, ছেদ, অনুসরণ করে সরব পাঠ দেবেন।

★ শিক্ষক শ্রুতিলিপি দেওয়ার সময় বাদ পড়ে যাওয়া শব্দগুলো যাতে যথাস্থানে লেখা হয় তার জন্য পুনরায় পাঠ দেবেন।

শ্রুতিলিপি লেখার পাঠ পদ্ধতি ঃ

★ প্রথমবারে শিক্ষকের পাঠ— শিশুর মনে বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া।

★ দ্বিতীয়বারের পাঠ— শ্রুতিলিপিটি লেখানোর জন্য।

★ তৃতীয়বারের পাঠ— লেখার সময় দ্রুততার জন্য যে অংশটি ছেড়ে গেছে বা বাদ পড়েছে তা লিখে নেবার জন্য।

সংশোধন ঃ

★ শিশুদের লেখার শেষে শিক্ষক মহাশয় লেখা সংগ্রহ করে ভুলগুলি সহানুভূতির সঙ্গে সংশোধন করে দেবেন।

★ উপরের শ্রেণিতে (চতুর্থ/পঞ্চম) ছাত্ররা একে অপরকে নিজের খাতা সংশোধন করতে দেবে। সর্বশেষে শিক্ষক মহাশয় তা সংশোধন করে দেবেন।

শ্রুতিলিপি লিখনের ফল ঃ

√ হস্তাক্ষরের ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায়

√ পাঠের একাগ্রতা বাড়ে

√ বানানোর জ্ঞান জন্মায়

√ ছেদ চিহ্নের ব্যবহারের বোধ জন্মায় ও দক্ষতা বাড়ে

√ স্মৃতি শক্তির অনুশীলন ঘটে

৪.৩.৫. সৃজনাত্মক লিখন ঃ

সৃজনীশক্তি শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও শিশুর এই সৃজনাত্মক ক্ষমতার বিকাশ দেখা যায়। নিত্য ব্যবহারিক জীবন থেকে গৃহীত অফুরন্ত শব্দ-বাক্য সে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে থাকে। প্রথমাবস্থায় শিশুর এই ধরনের কার্যে সাধারণত তার পরিজনেরাই সাহায্য করে থাকে। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে আসার পর শিশুর সৃজন ক্ষমতাকে আরও অভিমুখী, আরও বিকশিত করে তোলেন তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন লিখনকেই সৃজনাত্মক লিখন বলে। এই সৃজনাত্মক লিখন সবসময়ই গঠনমূলক হওয়া উচিত। শিশুর বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী সহজ থেকে ক্রমশ ভিন্নতর, পরিণত ও সাহিত্যধর্মী সৃজনাত্মক লিখনে সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হাতে কলমে বিভাগে সৃজনাত্মক লিখন-এর প্রচেষ্টা করা যায়। বাক্য বানাও, শব্দ ছক, ডায়েরি লেখা, বিভিন্ন শব্দকে পৃথক অর্থে আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করা, মতামত সম্বলিত বাক্য রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনাত্মক লিখনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যায়।

প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নির্দিষ্ট বইগুলিতে শিশুর বয়স ও মানসিক পরিণতি অনুযায়ী ধাপে ধাপে যেভাবে সৃজনাত্মক লিখনের সুযোগ রয়েছে, তা যদি শিশু শিক্ষকের সহায়তায় সদ্ব্যবহার করতে পারে, তবে ক্রমশ নিজেই এই ধরনের কাজে উৎসাহ পাবে ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যাবে। তাতে শিশুর হস্তাক্ষর স্পষ্ট ও সুন্দর হয়ে উঠবে। ফলে শিশুর ভাষার গঠনগত দিক সম্পর্কে যেমন শিক্ষালাভ করবে, তেমনই ভাষা প্রয়োগে ক্রমশ দক্ষ ও সুচারু হয়ে উঠবে এবং স্পষ্ট হস্তাক্ষরে মৌলিক লিখন ক্ষমতার অধিকারী হবে।

৪.৩.৬. হস্তলিপি

কোনো লিখন উপকরণের সাহায্যে ব্যক্তি যখন লিখনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে তখন হস্তলিপি সেই প্রকাশের মাধ্যম হয়।

সুন্দর হস্তলিপির বৈশিষ্ট্য ঃ

- স্পষ্টতা—প্রত্যেক লিপির নিজস্ব রূপ বজায় থাকবে। অক্ষরগুলিকে একটিকে ওপরের থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক করা যাবে।
- পাঠের বোধগম্যতা—পাঠের সময় পাঠক স্পষ্টভাবে অক্ষরগুলি পড়তে পারবে।
- সরলতা—বর্ণগুলি লেখার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা থাকবে না। প্রতিটি অক্ষর সরল, স্বচ্ছ হবে।
- সমতা—বর্ণগুলির আকারে সমতা থাকবে, একটি অক্ষর পাশের অক্ষরের তুলনায় আকারে ছোটো অথবা বড়ো হবে না।
- ব্যবধান—দুটি শব্দের মধ্যে, দুটি পঙ্ক্তির মধ্যে সম-ব্যবধান থাকবে।
- গতি—সঠিক গতি বজায় রেখে স্পষ্ট হস্তলিপিতে লেখার অভ্যাস তৈরি হবে।

হস্তলিপি সুন্দর করার উপায় ঃ

- ভালো পেন অথবা পেনসিল ব্যবহার করতে হবে।

- হাতের পেশী সঞ্চালনে যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বলার ভঙ্গি সঠিক হবে।
- পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতে হবে।
- দুটি শব্দের মধ্যে, পঙ্ক্তির মধ্যে সম-ব্যবধান, বর্ণের সমাকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- প্রারম্ভিক স্তরে লাইন টানা পৃষ্ঠায় লিখতে হবে।
- প্রতিটি লাইনে সাত থেকে এগারটি বেশি শব্দ লেখা বাঞ্ছনীয় নয়।
- অন্যের সুন্দর, স্পষ্ট হস্তাক্ষর নকল করা যেতে পারে।

৪.৩.৭ বানান বিধি

আমরা জানি মানুষ তার মনের বিচিত্রভাব প্রকাশ করার জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে অর্থপূর্ণ ধ্বনি প্রবাহের সৃষ্টি করে এবং সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ এই ধ্বনি প্রবাহ দ্বারাই অপরের সঙ্গে সর্বদা ভাবের আদান প্রদান করে চলেছে। এই সব অর্থপূর্ণ সাংকেতিক ধ্বনি প্রবাহই হল ভাষা। কাজেই এক্ষেত্রে সঠিক ভাবের আদান প্রদান এর জন্য বানানে সঠিক গঠন জানতে হবে। শব্দের অর্থ ও রূপের একটা সমাজ গ্রাহ্য নিয়ম আছে। লিখবার সময় নিয়ম মানা আবশ্যক। তবেই ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা হবে। এই হিসাবে বানান শুদ্ধি ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

অথচ নানা কারণে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করা একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই সমস্যা উদ্ভবের কারণগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

বর্ণমালা ত্রুটি ঃ

বাংলার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। সংস্কৃত থেকে বাংলা বর্ণমালার রূপ গৃহীত, অবশ্য রূপের বহিরঙ্গদিকে নয়— উচ্চারণের অন্তরঙ্গ দিকে। কাজেই বানানের পার্থক্যগুলি একান্তভাবে স্মৃতি নির্ভর। তাই বানান ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

বাংলা মিশ্রভাষা ঃ

তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব দেশী বিদেশী প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দের সমাবেশ ঘটেছে বাংলা ভাষায়। মিশ্র ভাষার ধ্বনিরূপ সর্বদা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল। স্থিতিশীল বর্ণমালার দ্বারা পরিবর্তনশীল উচ্চারণকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় না। মোট কথা বাংলা বর্ণমালায় সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আমরা এমন অনেক শব্দ আজকাল ব্যবহার করছি, যার ধ্বনিরূপ আমাদের বর্ণমালায় নেই, অনেক উচ্চারণ আছে যার বর্ণ নেই। তাই সমস্যা জটিল হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলা আকাদেমির পক্ষে থেকে কিছু বানান বিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সমস্যাও তিন ধরনের —

- বর্ণমালার সমস্যা
- ভাষার সমস্যা এবং
- উচ্চারণ সমস্যা।

বর্ণমালার সমস্যা

বাংলা শব্দ ভান্ডারের অন্তর্গত তৎসম শব্দগুলি অবিকৃত শব্দ, সুসংহত ব্যাকরণ দ্বারা সেগুলি নিয়ন্ত্রিত। বাংলা বর্ণমালা ও সংস্কৃত বর্ণমালা উচ্চারণগত দিক থেকে পৃথক। কারণ বাঙালীর জিহ্বায় শ.ষ.স.,ব.,ন.ণ, হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের—এদের উচ্চারণটার কোন ভিন্নতা নেই। অথচ এগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ সূত্র অনুযায়ী শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত। সেজন্য বানান ভুলের সমস্যা গুরুতর হয়েছে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলা বর্ণমালার সংস্কার সাধন কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কোথায় কিরূপ বানান বা বর্ণের ব্যবহার হবে সে সম্পর্কে বাংলা আকাদেমি গৃহীত বানান বিধি জানা প্রয়োজন। যেমন—

(১) ই, ঈ, উ, ঊ সম্পর্কে — তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে হ্রস্ব 'ই'-কার, 'উ'-কার এবং দীর্ঘ 'ঈ' কার, 'ঊ'-কার প্রচলিত এবং গৃহীত। তদ্ভব

বা অর্ধতৎসম শব্দে 'ঈ', 'ঊ' বা বিকল্পে 'ই', 'উ' ব্যবহৃত হবে, যেমন— পক্ষী, পাখী, পাখি; কুম্ভীর, কুমীর, কুমির; অর্থাৎ উদাহরণযুগ্মের মধ্যে দ্বিতীয়টি গৃহীত হবে। তবে হ্রস্ব বিকল্প না থাকলে তৎসম শব্দের বানানে দীর্ঘ স্বরচিহ্নই লিখতে হবে।

(২) সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় যুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে সমাসবন্ধ শব্দের ব্যাপারে সংস্কৃত মূল শব্দটির দীর্ঘ 'ঈ' কারের পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন— আগামীকাল, মন্ত্রীসভা, হস্তীদল ইত্যাদি। কিন্তু তৎসম ''ত্ব'' এবং ''তা'' প্রত্যয় যোগ করলে যে শব্দ পাওয়া যাবে সেগুলি হ্রস্ব 'ই'-কার রূপে লেখা হবে। যেমন : প্রতিযোগিতা, মন্ত্রিত্ব, সহমর্মিতা লিঙ্গান্তরে ''নী'' প্রত্যয় যোগের আগে এই নিয়ম পালিত হবে। যেমন— প্রতিযোগিনী।

(৩) বিসর্গ (ঃ) সম্পর্কে — সংস্কৃত শব্দের অন্তে থাকলে তা বর্জিত হবে। যেমন — যশ, মন, বৃক্ষ। কিন্তু শব্দের মধ্যে থাকলে বিসর্গ বজায় থাকবে এবং বিসর্গ সন্ধি অনুসারে বানান নির্ধারিত হবে। যেমন— মনঃ + যোগ = মনোযোগ, যশঃ + লাভ = যশোলাভ। ব্যাকরণ সম্মত বিকল্পরূপ থাকলে সেগুলি ব্যবহৃত হবে। যেমন : দুঃস্থ > দুস্থ; বয়ঃস্থ > বয়স্থ।

(৪) হসন্ত চিহ্ন সম্পর্কে — শব্দের অন্তে 'হস্' চিহ্ন বর্জনীয়। ক্রোধ, গর্জন, সাবাস, সবুজ ইত্যাদি। তবে সংস্কৃত সন্ধিজাত শব্দে পূর্বপদের শেষে হস্ চিহ্ন থাকবে। যেমন — দিক্‌ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, পৃথক্‌করণ।

(৫) রেফ (´) সম্পর্কে — সংস্কৃত শব্দে রেফ যুক্ত। ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব সর্বত্র বর্জনীয় — ধর্ম, কর্ম, মূর্খ আবার অসংস্কৃত শব্দেও রেফের পর দ্বিত্ব হবে না — সর্দার, কর্ম, পর্দা, সর্বা ইত্যাদি।

(৬) 'ঙ' এবং 'ং' অনুস্বর সম্পর্কে — ক, খ, গ, ঘ, ঙ পরে থাকলে সংস্কৃত শব্দে বিকল্প 'ম' স্থানে 'ং' অনুসার হবে। — অহংকার, সংখ্যা, সংঘ। যেসব শব্দে সন্ধি পরিণাম হিসাবে অনুস্বর আসে নি সেখানে ং অবৈধ। যেমন বঙ্গ, অঙ্ক, আতঙ্ক, শঙ্কা, সঙ্গে ইত্যাদি।

আবার ম-এর পরে বর্গীয় 'ব' থাকলে তা 'ম'-ই হবে। যেমন — সম + বোধন = সম্বোধন, আবার 'ম'-এর পর অন্তঃস্থ ব থাকলে ম বর্ণটি ং অনুস্বার হবে। যেমন কিংবদন্তি, কিংবা, সংবাদ। 'ঙ্গ' ও 'ঙ'-দুই-ই চলবে। যেমন — বাঙ্গালী > বাঙালী; ভাঙন > ভাঙন। তবে হসন্ত ধ্বনি হলে ং-ও বসতে পারে। যেমন — বাংলা।

(৭) কিছু বিশেষ্য শব্দে য-ফলা হবে। যেমন — চারিত্র্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি। বিশেষ ক্ষেত্রে ব-ফলা ভেঙে লেখা হয়। যেমন উদ্‌বাস্তু, উদ্‌বোধন। যেখানে আলাদা উচ্চারণ হয় না সেখানে উদ্যান, বিদ্বান, উদ্যম ইত্যাদি লেখা উচিত।

(৮) শ, ষ, স সম্পর্কে — সংস্কৃত শব্দানুযায়ী তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দে ''শ''-ই ব্যবহৃত হবে। বংশ > বাঁশ, মশক > মশা, কিশলয়, কোশ ইত্যাদি।

কিন্তু কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে যেমন — মনুষ্য > মিনসে, শ্রদ্ধা > সাধ। বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুযায়ী S বা Sh স্থানে শ বা ষ হবে। যেমন — শহর, ইস্কুল, পোশাক, আসল ইত্যাদি।

(৯) ন, ণ সম্পর্কে — অসংস্কৃত সমস্ত শব্দে 'ন' হবে — কান, সোনা, বামুখ, রানী ইত্যাদি। অর্ধতৎসম শব্দের মূর্ধন্য বর্গের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ণ'-র ক্ষেত্রে দন্ত 'ন' গ্রাহ্য হবে। যেমন প্যান্ট, লন্ঠন, কিন্তু তৎসমজাত অর্ধতৎসমতে আন্ডা, কুন্ডু, মুন্ডু, চন্ড হবে।

(১০) জ, য সম্পর্কে — নিম্নের শব্দে 'য'-র পরিবর্তে 'জ' ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। যেমন — কাজ, জুঁই, জাতি, জুত, জো, জোড়, জ্যোতি ইত্যাদি।

(১১) অর্ধতৎসম শব্দে য-ফলা ব্যবহৃত হবে কিন্তু বিদেশী শব্দে 'য'-ফলা চলবে না। যেমন — হিস্‌সা, লস্‌সি, মফস্‌সল ইত্যাদি।

(১২) 'ক্ষ'-র ব্যবহার — তদ্ভব শব্দের ক্ষুদ্র, ক্ষেত, ক্ষ্যাপা ইত্যাদি শব্দের 'ক্ষ'-র পরিবর্তে — খেত, খ্যাপা, খুদ ইত্যাদি লেখা চলে কিন্তু তৎসম ''ক্ষীর'' শব্দের পরিবর্তন হবে না।

(১৩) বাংলা শব্দভান্ডারে গৃহীত বিদেশী দীর্ঘ স্বরচিহ্ন না দিয়ে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমন — ইগল, ইদ, কমিটি, কিডনি, ক্রিম, গির্জা, টিন ইত্যাদি।

এই রকম বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে 'ণ'-এর বদলে 'ন' হবে। যেমন — ইরান, কার্বন, কোরান, পরগনা, রোমান, লন্ডন ইত্যাদি। lb বাংলায় লব লিখতে হবে। যেমন bulb > বালব হবে।

(১৪) আরবি-ফারসি শব্দ সম্পর্কে —

ইসলাম, মুসলিম, সাবান, সাহেব আবার — কিশমিশ, উশুল, তপশিল, পোশাক, বালিশ, বাদশাহি শব্দগুলি ‘শ’ ব্যবহৃত হবে।

ইংরাজি শব্দগুলিতে ‘শ’ হবে — নোটিশ, কার্নিশ, পুলিশ, মেশিন, শ্যালো, রাবিশ।

s-এর উচ্চারণ বাংলায় ‘স’ দিয়ে হবে। যেমন — ইস্কুল, নার্স, মিস, জুস, মেস, সুটকেস ইত্যাদি।

z-এর উচ্চারণ ‘জ’ হবে। যেমন — অজু বা ওজু।

(১৫) বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ‘অ্যা’ ধ্বনি দিয়ে শুরু এমন শব্দের প্রথম বর্ণে সর্বত্রই ‘অ্যা’ ব্যবহারযোগ্য। যেমন — অ্যাকাডেমি, অ্যাভিনিউ, অ্যাংলো ইত্যাদি।

(১৬) ব্যক্তিনাম বা পদবীর ক্ষেত্রে তাই গ্রাহ্য। কিন্তু বিদেশী নামের বাংলা বানানে অবশ্যই হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন Bill Clinton বিল ক্লিন্টন, Robin রবিন।

গ্রন্থ নামে মূল বানান মান্য থাকবে। যেমন — পথের পাঁচালী, রাধারানী।

বাঙালীদের পদবির ইংরাজি ধরনের রূপ হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন — গাঙ্গুলি, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি।

(১৭) তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ‘ৎ’ বর্ণটি অপরিহার্য। যেমন — সত্যজিৎ, ভবিষ্যৎ, চিৎকার।

অর্ধতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ‘ৎ’ ‘ত’ বর্ণে ব্যবহৃত হবে। যেমন — জহরত, কৈফিয়ত, ইজ্জত, মহরত ইত্যাদি।

(১৮) ঐ-কার বা ঔ-কার বলে অই বা ওউ প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যাবে। যেমন — বউ, দই, খই, কই ইত্যাদি।

(১৯) অর্ধতৎসম শব্দ ও তদ্ভব শব্দে ‘জ’ বদলে ‘য’ ব্যবহৃত হবে। যেমন — যখন, যত, যাওয়া, যবে।

(২০) কী ও কি — ‘কী’-এর প্রয়োগ কখনও প্রশ্নসূচক সর্বনাম, কখনও বিশেষণের বিশ্লেষণ — কী চমৎকার। তুমি কী দেখছো বলবে তো।

যেসব প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’-সূচক সেখানে হ্রস্ব ই-কার হবে। যেমন— তুমি কি বলটা পেয়েছ?

ভাষার সমস্যা

মানুষ সামাজিক জীব। সেই হিসাবে ভাষার একটা সমাজ গ্রাহ্য রূপ আছে। ভাষাকে লিখিত চিহ্নের দ্বারা স্থায়িত্ব দিতে হবে এই চিহ্নগুলি একটা সমাজগ্রাহ্য ও সর্বজনবোধ্য রূপ থাকবে। যেমন দিবস বুঝতে দিন লিখব আর দরিদ্র বুঝতে দীন লিখব। নদী আর যদি বানানের দিক থেকে পৃথক হলেও উচ্চারণ-গত দিক থেকে এদের কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা কোন্ কোন্ অর্থের শব্দকে বুঝতে হবে তারও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। কাজেই খামখেয়ালিপনা চলবে না। ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য বানান বিধি মেনে ঠিক শব্দটির ঠিক বানান-ই লিখতে হবে।

উচ্চারণ সমস্যা

উচ্চারণের তারতম্য বক্তব্যের অর্থবোধেও তারতম্য ঘটায় এবং কোন কোন সময় তা বিশেষ প্রমাদ সৃষ্টি করে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শুদ্ধ উচ্চারণের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভাষা শুনে বুঝতে পারার এবং ভাষা ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা অর্জনে উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ হলে এই উভয় প্রকারদক্ষতা অর্জনেও ত্রুটি দেখা দেবে। উচ্চারণের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে বানানশুদ্ধি। অথচ বাংলা ভাষায় বানান বিশুদ্ধি রক্ষা করা একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বানান ভুলের সমস্যা

প্রথমত ঃ **শ্রদ্ধার অভাব** — বাংলা ভাষা তথা শুদ্ধ বানানের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। ইংরাজিতে বানান ভুল করলে আমরা যতটা লজ্জিত হই, বাংলা বানান ভুলে তা হই না। উপরন্তু বাংলা ভাষার অজ্ঞতায় যেন একটা আত্মশ্লাঘার ভাব দেখা যায়। তাই বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও অনুরাগ থাকলে ভুল অনেক কমে যাবে।

দ্বিতীয়ত ঃ **ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাব** — বাংলা তৎসমশব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ব্যাকরণ জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক বানান বিধির জ্ঞানের অভাবও বানান ভুলের অন্যতম কারণ। কালিদাস, প্রতিযোগিতা, পৌরোহিত্য, ভৌগোলিক

ইত্যাদি শব্দের ভুল প্রয়োগ প্রায়শই হয় তার কারণ সীমিত ব্যাকরণ জ্ঞান। সন্ধির সূত্র, ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান, সমাস প্রত্যয় ও বিসর্গ জ্ঞানের অভাবই বানান ভুলের উৎস।

তৃতীয়ত ঃ ছাপার অক্ষরে কোনো বানান ভুল শিশুর মনে গভীর রেখাপাত করে। তার ছাপা অক্ষরকে অভ্রান্ত বলে মনে করে। কাজেই বানান ভুলের অন্যতম কারণ — ভুল ছাপা বানান।

চতুর্থত ঃ **মনোযোগের অভাব —** শিশুরা আজকাল লেখার ক্ষেত্রে বড় অলস। ছাত্ররা বানান দিয়ে অভ্যাস করে না, পড়ে মুখস্থ করে। শুদ্ধ বানান রূপটি স্মৃতিজাত হলে বানান ভুল অবশ্যম্ভাবী। কারণ লিখিত অভ্যাসের দ্বারা রপ্ত বানানের রূপটি আমাদের অবচেতন মনে মুদ্রিত হয়ে যায়।

পঞ্চমত ঃ **শব্দ তথা বানান দূষণ —** দোকানের সাইনবোর্ড-এ, রাস্তাঘাটে, বিভিন্ন পোস্টারে, খবরের কাগজে যুক্তাক্ষরকে ভেঙে লেখার বিকৃতি — শিশুদের বারবার চোখে পড়ে। ফলে শিশু ঐ ভুল বানান-ই শেখে।

ষষ্ঠত ঃ আঞ্চলিক ত্রুটি ও বানান ভুলের অন্যতম কারণ। শ, স, ড়, র, ন, ল প্রভৃতি বর্ণের অপপ্রয়োগ জনিত উচ্চারণগত ত্রুটি বানান ভুলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ, চতুর্থ বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণও শোনা যায়। যেমন — ভাত > বাত। অনেক সময় শিশু মনের অজান্তে তার নিজস্ব উচ্চারণের সাথে মিল রেখে লেখার জন্য এই জাতীয় বানান ভুল করে থাকে।

সপ্তমত ঃ **সাদৃশ্যবোধ —** কণ্ঠস্থ, মধ্যস্থ এখানে 'স্থ' অবস্থানে অর্থে ব্যবহৃত কিন্তু যদি কেউ 'আক্রান্ত' অর্থে 'স্থ' লেখে তবে বানান ভুল হতে বাধ্য। যেমন বিপদে আক্রান্ত হওয়া অর্থে বানানটি হবে বিপদগ্রস্ত। 'স্ত' লেখাটাই বাঞ্ছনীয়।

বানান ভুলের সমস্যার প্রতিকার

প্রথমত ঃ বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালী শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং ভাষার শুদ্ধতা রক্ষায় তাদের আগ্রহী হতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বানান মুখস্থ করলে হবে না। হাতের আঙ্গুলের পেশী-শক্তির অনুশীলনের জন্য লিখে অভ্যাস করতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়টি অনুশীলনের সময় শিশু যত বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করবে শিক্ষা ততবেশী দ্রুত ও সফল হয়। তাই বানান লেখার সময় যদি সঙ্গে সঙ্গে তা বানান করে পড়ে তাহলে একধারে পেশীশক্তি, বাচনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার হবার ফলে শিশু বানান লিখনে সহজে অভ্যস্ত হতে পারবে।

চতুর্থ ঃ যে সমস্ত বানান ভুল হয় তার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। শূন্যস্থানে বসাবার সুযোগ করে দিয়ে ভুল হবার সম্ভাবনাময় বানান শেখানোযেতে পারে। প্রয়োজনে বানান বিষয়ক খাতা তৈরি করতে পারে।

পঞ্চমত ঃ শিশুদের সামনে শুদ্ধ বানানই রাখতে হবে। অশুদ্ধ বানান কোনো উদ্দেশ্যেই রাখা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ অনুধাবনের ফলে ভুলটাই স্থায়ী হয়ে যায়।

ষষ্ঠত ঃ প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য আছে — শিশুকে তা বোঝাতে হবে। ষ-ত্ব, ণ-ত্ব নিয়মাবলী শেখাতে হবে।

সপ্তমত ঃ প্রাথমিক স্তর থেকে 'অভিধান' ব্যবহারের অভ্যাস করানো দরকার। সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিকে ব্যবহৃত পাঠ্যগ্রন্থের বিষয়গুলি থেকে শব্দ চয়ন করে অভিধান প্রস্তুত করা যেতে পারে। এভাবে অভিধান ব্যবহারের দক্ষতা ও বোধ দুটোই বাড়ে।

অষ্টমত ঃ শ্রুতিলিখন — বানান ভুল প্রতিকারের অন্যতম পন্থা বা পদ্ধতি হল শ্রুতিলিখন। শ্রুতিলিখনে বানান সংশোধনের চেয়ে যাতে বানান ভুল না হয় তার প্রচেষ্টাই বেশী। ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা এবং শুদ্ধ বানান লিখন বারবার অনুশীলন দ্বারা পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারলে বানান ভুল কমে যাবে। শ্রুতিলিখনে ছেদ চিহ্নের ব্যবহারে দক্ষতা ও বোধ দুটোই বাড়ে।

এইভাবে প্রথম থেকেই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে বানান ভুলের সমস্যা অনেক কমে যাবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

(১) বানান ভুলের প্রতিকারের উপায়গুলি উল্লেখ করুন।

(২) বাংলা বানান ভুলের কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) শিক্ষার্থীর সৃজনাত্মক লিখন বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা কেমন হওয়া প্রয়োজন?

৪.৪. শব্দ ভান্ডারের বিকাশ ঃ

শব্দ ভান্ডারই হল ভাষার প্রধান সম্পদ। শব্দ সম্পদই ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। যে ভাষার শব্দভান্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ, সে ভাষার ঐশ্বর্যও তত বেশি। আর এই শব্দভান্ডারের সমৃদ্ধিতে বাংলা ভাষা উজ্জ্বল। বাংলা শব্দ ভান্ডারে একদিকে প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ যেমন আছে তেমনি আছে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ। এই দ্বিমুখী কৌশলে বাংলা ভাষা তার শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

বাংলা ভাষায় প্রধানত দু'ধরনের শব্দ আছে —

(১) মৌলিক শব্দ

(২) আগন্তুক শব্দ

মৌলিক শব্দ ঃ

সংস্কৃত থেকে যে সব শব্দ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলা শব্দভান্ডারে এসেছে মূলত আমরা সেইসব শব্দগুলিকেই মৌলিক শব্দ বলব। এই মৌলিক শব্দ আবার তিন প্রকার — (ক) তৎসম (খ) অর্ধতৎসম (গ) তদ্ভব

(ক) তৎসম শব্দ ঃ যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিত অবস্থায় বাংলা শব্দভান্ডারে এসেছে, সেইসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। ('তৎ' মানে তাহার অর্থাৎ সংস্কৃত, 'সম' মানে সমান)

উদাহরণ ঃ আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, নর, লতা, অগ্নি, ঈশ্বর, অক্ষি, অশ্ব, কান্তি, কবি, গগন, উত্তর, সাধু, বায়ু ইত্যাদি

(খ) অর্ধতৎসম শব্দ ঃ যেসব সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা শব্দভান্ডারে প্রবেশ করেছে, সেইসব শব্দকে অর্ধতৎসম শব্দ বা ভগ্নতৎসম শব্দ বলে। আসলে কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষাতে প্রবেশের পর পরিবর্তিত হয়েছে, যেগুলি হল অর্ধতৎসম শব্দ।

উদাহরণ ঃ কৃষ্ণ > কেষ্ট, মন্ত্র > মন্তর, নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন, জ্যোৎস্না > জোছনা, বৈষ্ণব > বোষ্টম ইত্যাদি

(গ) তদ্ভব শব্দ ঃ যে সব সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত স্তরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা শব্দ ভান্ডারে প্রবেশ করেছে, সেগুলিকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়। তদ্ভব শব্দগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্য দিয়ে বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে বাংলাতে গৃহীত হয়েছে।

উদাহরণ ঃ	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাংলা
	একাদশ	এগ্‌গারহ	এগার
	মৃত্তিকা	মট্টিআ	মাটি
	ষোড়শ	সোলহ	ষোল
	ইন্দ্রাগার	ইন্দ্রা আর	ইঁদারা
	ব্রাহ্মণ	বম্‌হণ	বামুন

আগন্তুক শব্দ ঃ সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য দেশি কিংবা বিদেশি ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলা শব্দ ভান্ডারে প্রবেশ করেছে, সেগুলিকে আগন্তুক শব্দ বলে। আগন্তুক শব্দ দুই প্রকার — (ক) দেশি আগন্তুক (খ) বিদেশি আগন্তুক

(ক) দেশি আগন্তুক শব্দ ঃ দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা থেকে যে শব্দগুলি বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলিকে দেশি শব্দ

বলে। কোল, ভিল, মুন্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন অনার্য ও উপজাতিদের ভাষা থেকে যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলি হল দেশি শব্দ।

উদাহরণ ঃ কুলো, কুক্কুর, ঝোল, ঝিঙ্গা, ঢোল, ঝাঁটা, ডাব, বাদুড়, ঝুলি, চাউল, ঘোড়া, খোকা, ডাহা ইত্যাদি।

(খ) বিদেশী আগন্তুক শব্দ ঃ বিদেশের বিভিন্ন ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলা ভাষাতে এসেছে তাদের বিদেশি শব্দ বলে।

উদাহরণ ঃ (১) তুর্কি শব্দ ঃ পাশা, বেগম, উজবুক, খাতুন, আলখাল্লা

(২) ফারসি শব্দ ঃ আইন, আদালত, উকিল, খাজনা, আল্লা, আজান, খাতা, চাকর, হিসাব, মশলা ইত্যাদি

(৩) আরবি শব্দ ঃ কেতাব, মজুত, এজলাস, আমলা, ফসল, জিলা, গলদ ইত্যাদি

(৪) পর্তুগিজ শব্দ ঃ জানালা, বোমা, আলকাতরা, আলপিন, বেহালা, সাবান, বাসন, বোতাম, আলমারি, বারান্দা, বালতি ইত্যাদি

(৫) ওলন্দাজ শব্দ ঃ রুইতন, হরতন, ইস্কাবন, তুরুপ ইত্যাদি

(৬) চিনা শব্দ ঃ চা, চিনি ইত্যাদি।

(৭) বর্মী শব্দ ঃ ঘুগনি, লুঙ্গি ইত্যাদি।

(৮) জাপানি শব্দ ঃ রিক্‌শা ইত্যাদি।

(৯) ইংরেজি শব্দ ঃ কলেজ, চেয়ার, টেবিল, স্কুল, সিনেমা, পেন, টিকিট, ফোন, ফটো ইত্যাদি

মিশ্রশব্দ, সংকর শব্দ বা জোড়কলম শব্দ ঃ

মৌলিক ও আগন্তুক শব্দের মিশ্রণে, প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগে যখন বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ সৃষ্টি হয় তখন তাকে মিশ্র শব্দ বা সংকর শব্দ বলে।

উদাহরণ ঃ দেশি + বিদেশি — হাটবাজার, মাস্টারমশায়

বিদেশি + বিদেশি — মাস্টারি, উকিল-ব্যারিস্টার

বিদেশি + তৎসম — হেড পন্ডিত, ভোটদাতা

বাংলা + বিদেশি প্রত্যয় — ফুলদানি, ঠিকাদার

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

(১) শব্দভান্ডার কাকে বলে?

(২) তৎসম শব্দ বলতে কি বোঝেন?

(৩) দুটি করে আরবি ও ফারসি শব্দের নাম বলুন।

(৪) সংকর শব্দ কাকে বলে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

৪.৫. সারসংক্ষেপ ঃ

ভাষা শিক্ষার প্রধান চারটি স্তম্ভ-শ্রবণ, কথন, পঠন, লিখন। আর এই চারটি দক্ষতা পর্যায় ক্রমে ধাপে ধাপে শিক্ষা দিতে হবে। প্রথম পর্যায়ে শ্রবণ ও কথন এবং দ্বিতীয় ধাপে পঠন ও লিখনের প্রতি জোর দিতে হবে। তবে চারটি দক্ষতার কথা বলা হলেও একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। আবার লেখার ক্ষেত্রে যাতে শিশু সৃজনাত্মক লিখনের প্রতি অগ্রসর হয় তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। আর ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষত লেখার ক্ষেত্রে বানান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বানান ভুলের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে এবং একাডেমি বানান বিধি মেনে চলতে হবে। শিশুর ভাষা শিক্ষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয় ফলে তার শব্দ ভান্ডার ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। তাই শিক্ষার্থীদের শব্দভান্ডারের যথাযথ জ্ঞানও আবশ্যিক।

৪.৬. অনুশীলন ঃ

(১) ভাষা শিক্ষার কয়টি স্তম্ভ আছে —

(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

(২) ছড়া পাঠের আদর্শপদ্ধতি —

(ক) সরব পাঠ (খ) নীরব পাঠ (গ) স্বাদনা পাঠ (ঘ) বিবৃতিমূলক পাঠ

(৩) সৃজনাত্মক লিখন শুরু করা উচিত —

(ক) প্রথম শ্রেণি থেকে (খ) দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে (গ) তৃতীয় শ্রেণি থেকে (ঘ) চতুর্থ শ্রেণি থেকে

(৪) বাংলা শব্দ ভান্ডারে কয় ধরনের শব্দ আছে —

(ক) ২ ধরনের (খ) ৩ ধরনের (গ) ৪ ধরনের (ঘ) ৮ ধরনের

(৫) সঠিক বানানটি বল —

(ক) মূল্যায়ন (খ) মূল্যায়ণ (গ) মুল্যায়ন (ঘ) মুল্যায়ণ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) কথন বলতে কি বোঝেন?

(২) শ্রুতিলিখন কি?

(৩) সরব পাঠের দুটি অসুবিধা লিখুন।

(৪) আদর্শ পাঠের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(৫) মিশ্রশব্দ কাকে বলে?

(৬) দুটি আগন্তুক শব্দের নাম বলুন।

সংক্ষিপ্ত / রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) ভাষা শিক্ষার চারটি দক্ষতা —শ্রবণ, কথন, পঠন, লিখন — সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) সরব পাঠ ও নীরব পাঠের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(৩) প্রাথমিক শ্রেণিতে সরব পাঠ কেন বেশি উপযোগী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

(৪) বাংলা শব্দ ভান্ডারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(৫) 'সৃজনাত্মক লিখন' বিষয়টি বর্তমান পাঠ্যক্রমে কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন।

(৬) বাংলা বানান সমস্যার কারণ ও তার প্রতিকারের উপায়গুলি বলুন।

অধ্যায়

৫

পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং পাঠটীকা প্রণয়ন

৫.১. সূচনা

কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটা পূর্ব পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। কারণ পরিকল্পনা রচনা করা থাকলে সেই অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হওয়া যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষা ব্যবস্থা সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য যেমন পরিকল্পনার প্রয়োজন ঠিক তেমনই শ্রেণিশিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা তথা পাঠদানের ক্ষেত্রেও একটি পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ পরিকল্পনায় বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। আবার শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সফল ও সুন্দর করে তোলার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর এই কৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ। তাই শ্রেণিশিক্ষা পরিচালনা কালে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের যথাযথ ব্যবহারের উপর এখন জোর দিতে বলা হচ্ছে।

৫.২. উদ্দেশ্য ঃ

- শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে আরও সুন্দর আকর্ষণীয় করা।
- বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুরাগের অনুসারী করে পাঠের লক্ষ্য নির্ণয়।
- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও ছাত্রের মানসিক ক্ষমতা ও স্তর অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনা।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তত্ত্বাবধায়কদের কাজে আরও পারদর্শী করে তোলা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবন করা।
- শিক্ষার্থীদের আরও বেশি সক্রিয় করে তোলার উপর জোর দেওয়া।
- অব্যবহৃত জিনিস বা বস্তুর ব্যবহার করে উপকরণ তৈরী করা।
- অনুপাঠ টীকা, বৃহৎপাঠ টীকা কিংবা সক্রিয়তা ভিত্তিক কর্মপত্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নির্ধারণ করা।

৫.৩. বিষয় বস্তুর ধারণা ঃ

৫.৩.১. পাঠ পরিকল্পনা-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

পাঠপরিকল্পনার উৎস গেস্টাল্ট মনস্তত্ত্ব। শিখনের গেস্টাল্ট তত্ত্ব মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষকতা বৃত্তিতে সফলতা লাভের জন্য শিক্ষককে নানাভাবে পরিকল্পনার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমে শিক্ষণের জন্য তিনি পাঠক্রমের বিন্যাস করবেন অর্থাৎ পাঠক্রমের পরিকল্পনা করবেন এবং তারপর পাঠক্রমের অর্ন্তভুক্ত বিষয়সূচির পরিকল্পনা রচনা করা হবে। এই বিষয়সূচি বা পাঠ্যাংশের বিন্যাসকরণের নাম একক পরিকল্পনা। শিক্ষকের পরবর্তী কাজ হল শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা। এটাই হল প্রত্যক্ষ শিক্ষামূলক কাজ। সুতরাং এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার জন্যও পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিক্ষক-দৈনন্দিন পাঠ পরিচালনার জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করেন, তাকেই বলে পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)।

পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ

- বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রেণির পাঠ্যসূচির পাঠদান সম্পূর্ণ করা।
- শ্রেণি অনুযায়ী পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির বিভিন্ন একক ও উপএকক অবলম্বনে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠে অগ্রসর হওয়া।
- পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ টীকা অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রেখে পাঠদানের মাধ্যমে তাদের পাঠে আগ্রহী ও উৎসাহী করা।
- পাঠ পরিকল্পনার আরও একটি উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীদের নিকট বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলা। কাজেই সেই অনুযায়ী শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহার করে পাঠে অগ্রসর হওয়া।

* শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি ও পূর্বার্জিত জ্ঞান স্মরণে রেখে পাঠদান করা।

পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

(১) **পূর্বার্জিত জ্ঞানের ভিত্তি ঃ** পূর্বাজিত জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষক নূতন ধারণা দান করেন। এতে শিক্ষার্থীদের নতুন ধারণা লাভে সুবিধা হয়।

(২) **যথোপযুক্ত পরিবেশ ঃ** যেহেতু উদ্দেশ্য স্থির সেহেতু শিক্ষণ কৌশল, পদ্ধতি, শিক্ষোপকরণের ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষক আগে থেকে ভেবে নিতে পারেন। এর ফলে পাঠগ্রহণের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

(৩) **নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ঃ** নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে পাঠদানের জন্য একটি পরিকল্পনাই হল পাঠ পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত বিষয় পাঠের সুযোগ থাকে না।

(৪) **নির্দিষ্ট সময়সূচি ঃ** প্রত্যেক শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট সময় মেনে কাজে অগ্রসর হন এবং সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার চেষ্টা করেন। ফলে সময়ের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

(৫) **মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাদান ঃ** পাঠটীকা রচনাকালে শিক্ষককে প্রথমেই তাঁর কৌশল পদ্ধতি চিন্তা করতে হয়। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, রুচি, সামর্থ্য প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

(৬) **আত্মবিশ্বাস ঃ** বিশেষ বিষয়টি পরিকল্পিতভাবে পাঠদান করলে শিক্ষক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস লাভ করবেন এবং শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীরা প্রাণবন্ত পাঠগ্রহণের সুযোগ পাবে।

(৭) **উপকরণের সদ্ব্যবহার ঃ** কী কী উপকরণ ব্যবহার করলে পাঠকে মনোগ্রাহী, চিত্তাকর্ষক ও আনন্দময় করে তোলা যায় তা শিক্ষককে আগেভাগে চিন্তা করে শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

(৮) **শিক্ষণপটুত্ব বিকাশে সহায়ক ঃ** শিক্ষকের শিক্ষণ পটুত্ব বা দক্ষতা বিকাশে পাঠটীকা যথেষ্ট সহায়ক।

(৯) **ধারাবাহিকতা ঃ** পাঠদানকালে পাঠ্যবিষয়টির ধারাবাহিকতা ও নির্দিষ্ট গতি বজায় রাখতে সাহায্য করে পাঠ পরিকল্পনা। কারণ শ্রেণির সামগ্রিক পাঠ্য বিষয়কে বা পাঠ্যসূচিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একক উপএককে বিভাজন করে নিলে সমগ্র বিষয়টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

(১০) **শৃঙ্খলা বজায় ঃ** প্রথম থেকে শিক্ষক যদি পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে তার পাঠ্যবিষয়, পদ্ধতি, পাঠোপকরণ, সময় ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে থাকেন, তাহলে পাঠদানকালে শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না; বরং শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

(১১) **শিক্ষাগত গুণমান ঃ** শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী পাঠদান করা অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রেখে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষার মান ও গুণকে যথাযথ বজায় রাখার জন্য পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন।

(১২) **চিন্তায় স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা ঃ** পাঠ-পরিকল্পনা তৈরির ফলে শিক্ষকের চিন্তায় আসে স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা। চিন্তার কোনো প্রতিবন্ধকতা স্থান পায় না।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

(১) পাঠ পরিকল্পনা কাকে কি?

(২) শ্রেণি শৃঙ্খলার সঙ্গে পাঠ পরিকল্পনার সম্পর্ক কোথায়?

(৩) পাঠপরিকল্পনা কেন প্রয়োজন।

৫.৩.২. অনুপাঠটীকা, বৃহৎ পাঠটীকা প্রস্তুতকরণ এবং অভ্যাস গঠন ঃ

৫.৩.২.১. অনুপাঠটীকা ঃ

অধ্যাপক কিথ অ্যাচিসন ১৯৬১ সালে প্রথম 'মাইক্রো টিচিং' বা অনুপাঠের প্রস্তাব করেন। এটি শিক্ষক শিক্ষণের একটি অভিনব পরীক্ষাগার পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সাধারণ ক্লাসরুম পদ্ধতির জটিলতাগুলির সরলীকরণ সাধিত হয়েছে। ছাত্রসংখ্যা, পঠনপাঠন সময় ও পাঠনপটুত্ব (skill) -এই তিন দিক থেকে এই পদ্ধতিকে একটি 'Scaled down teaching' বা 'ক্ষুদ্রীকৃত পাঠন ক্রিয়া' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অনুশিক্ষক বা Micro teacher যে কোনো পাঠন পটুত্বের উপর ভিত্তি করে Plan বা পরিকল্পনা করেন এবং একটি অনুপাঠ দেন (Teaching)। এই পাঠ নথিযুক্ত বা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণকারীর (Observer) দ্বারা তাৎক্ষণিক পরিপরামর্শ (Feed back) দেওয়া হয়। যে পরিপরামর্শ পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে পাঠটি পুনরায় পরিকল্পিত (Re Plan) হয়। ভিন্ন শিক্ষার্থীদলের কাছে পুনঃপাঠন (Re Teach) হয়। এরপর একই পর্যবেক্ষণকারী দ্বারা পুনঃ পরিপরামর্শ (Re-Feed back) দেওয়া হয়। এভাবে একটি অনুপাঠ বৃত্ত হল — পাঠ পরিকল্পনা (Plan) → পাঠদান (Teach) → পরিপরামর্শ (Feed back) → পুনঃপরিকল্পনা (Re-Plan) → পুনরায় পাঠদান (Re-teach) → পুনরায় পরিপরামর্শ (Re-Feed back)।

ধারণার বৈশিষ্ট্য ঃ

- অনুশিক্ষণ কার্যটি শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থায় হবে।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সহপাঠীগণ শিক্ষার্থীর ভূমিকায় থাকবেন।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ থেকে ১০ জন হবে।
- অনুশিক্ষণের জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকবে ৫ বা ৬ মিনিট।
- বিষয়বস্তু ছোট বা একক ধারণা সম্পন্ন হবে।
- এই শিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয় পটুত্ব এবং তার অন্তর্গত উপাদান সমূহে।
- অনুশিক্ষণ দেবার পরেই Feed back দেওয়া হবে। এর ওপর ভিত্তি করে Re-Plan হবে এবং Re-Teach করবেন। তবে Re-Teach অন্য দলে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।
- একটি পটুত্ব অনুশীলনের সময় যেন অন্য কোনো পটুত্বের কোনো উপাদান না আসে তা লক্ষ রাখতে হবে।

ধারণার তাৎপর্য ঃ

- এটি নিরাপদে অনুশীলন করা যায়।
- অবিরত প্রশিক্ষণের এটি একটি মাধ্যম।
- একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে বিদ্যার্থী পাঠন-পটুত্বের বিকাশ-সাধনে অনুশীলন করতে পারেন।
- পাঠনকার্য পরিবেক্ষণের ব্যাপারে এটি একটি উত্তম পরিবেশ ও বাস্তব মনোভঙ্গি সৃষ্টি করে।
- পাঠন সময় পাঠ এককের বিষয় বস্তু, পাঠন কৌশল এবং বিদ্যার্থী — এইসব পরিবর্তনশীল উপাদানের উপর গবেষক অধিকতর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে বলে এই অনুশিক্ষণ পদ্ধতি গবেষণা সহায়ক হয়ে ওঠে।

পদ্ধতির শিখন প্রক্রিয়া ঃ

জ্ঞান অর্পণ ঃ

- শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুশিক্ষণ পাঠদানের অভ্যাসের পূর্বে শিক্ষক প্রতিটি পটুত্বের উপর প্রতিপাদন পাঠ দেবেন।
- বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের এবং প্রতিটি পটুত্বের উপর নমুনা পাঠ পরিকল্পনা প্রশিক্ষণার্থীকে দেওয়া হবে।

পটুত্বগুলি বৃহত্তম শিক্ষণে বদল ঃ

পাঠন পটুত্বগুলি অভ্যাস করার পর সেগুলিকে সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ণমাত্রিক পাঠটীকা অবলম্বনে

Macro teaching সফল হয়ে থাকে। সমগ্র পাঠন পটুত্বের সমন্বিত করণই হল Macro teaching-এর লক্ষ্য। এই পূর্ণমাত্রিক পাঠদানের সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছাবার পথে অনুপাঠনের অভ্যাসগুলি এক একটি মাইলস্টোন মাত্র। একটি মাইলস্টোন পেরোতে গিয়ে বাধা আসতে পারে, ভুল হতে পারে — যেটাকে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে, বাধাকে দূর করে সামনের মাইলস্টোনের দিকে এগোনো যায়। এই ভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট পটুত্বের দক্ষতা অর্জন করতে না পারছেন ততক্ষণ তিনি বারবার পাঠদান করবেন। বার বার পাঠদানকে অনুশিক্ষণ চক্র (Micro teaching Cycle) বলে।

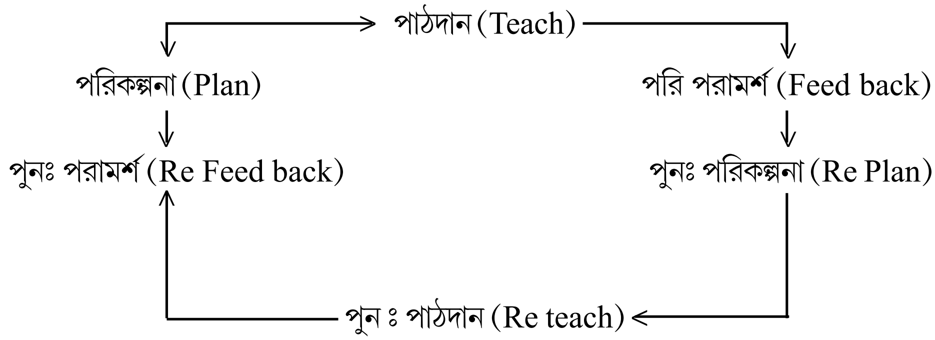

অনুশিক্ষা চক্র (Micro teaching Cycle)

প্রকারভেদ ঃ

অনুশিক্ষা বা Micro teaching পাঠক্রমের একটি নবতম অধ্যায়। গুণগত উৎকর্ষের জন্যে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীতে এটি সংযোজিত হয়েছে। এটি সর্ব দিক সমন্বিত পদ্ধতি না হলেও পটুত্ব আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি নির্ণায়ক ও প্রতিকার মূলক কৌশল বলে চিহ্নিত করা যায়। অ্যালন রায়ন, ড. পালি, ড. জাঙ্গিরা প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ পাঠন পটুত্বগুলির সংখ্যাগত আকার দিতে চেষ্টা করেছেন। 'সার্থক শিক্ষক' পদবাচ্য হতে হলে মোট আঠারোটি পাঠন পটুত্ব আয়ত্ত করতে হবে। তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষণ সংস্থা মোট পাঁচটি পটুত্ব গ্রহণ করেছেন —

(ক) সমন্বিত অনুবন্ধকরণ (Skill of Integration through correlation of subject)

(খ) শিশুকেন্দ্রিক পাঠ পরিচিতি করণ (Skill of Introducting Child Centric Lesson)

(গ) শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক প্রশ্নকরণ (Skill of Encouraging and Questioning by the learner)

(ঘ) শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক পর্যবেক্ষণ (Skill of Encouraging Observation by the learner)

(ঙ) কলা কৌশল উপস্থাপনে সমন্বয় সাধন (Skill of Integrating Performing Art)

সমন্বিত অনুবন্ধকরণ

ব্যবহৃত আচরণ সমূহ ঃ

১। শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয়করণ

২। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ

৩। শিক্ষার্থীদের দ্বারা যথাযথ উদাহরণ প্রদান

৪। সাধারণীকরণ

শ্রেণি — পঞ্চম	বিষয় — মাতৃভাষা (বাংলা)
শিক্ষার্থীর সংখ্যা —	একক — বোকা কুমিরের গল্প
শিক্ষকের নাম —	— উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
সময় — ৬ মিনিট	উপএকক — প্রথম আট অনুচ্ছেদ
তারিখ —	"কুমির আর শিয়াল মিলে............. খড়গুলো পেল"

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ / আচরণ	শিক্ষার্থীর কাজ / আচরণ	আচরণাঙ্গ
কুমির আর শিয়াল মিলে ………………… ………………… ………………… ………………… খড়গুলো পেল।	১। কুমির আর শিয়াল মিলে আলু চাষ করলো — আলু কোথায় ফলে?	১। আলু মাটির নীচে ফলে	১। দৃষ্টান্তগ্রহণ
	২। কোন মাটিতে আলু চাষ ভালো হয়।	২। বেলে মাটিতে	২। দৃষ্টান্তগ্রহণ
	৩। বছরের কোন সময়ে আলু চাষ করা হয়।	৩। শীতকালে	৩। দৃষ্টান্তগ্রহণ
	৪। পাঠ্যাংশে তোমরা পাঠ্য আর কোন কোন বিষয়ের যোগ দেখতে পাচ্ছ?	৪। ভূগোল, বিজ্ঞান	৪। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয়করণ, অনুবন্ধস্থাপন
	৫। উদাহরণ দাও	৫। দেশের কোন অঞ্চলে আলু ও ধান চাষ হয় — (ভূগোল) কী রকম মাটি আলু চাষের জন্য প্রয়োজন — (বিজ্ঞান) শিয়াল ও কুমীর কি জাতীয় প্রাণী — (প্রাণী বিজ্ঞান)	৫। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয়করণ, অনুবন্ধস্থাপন
	৬। ধান চাষ করে কি কি পাওয়া যায়?	৬। চাল, খড়, ধান ইত্যাদি	৬। দৃষ্টান্তগ্রহণ
	৭। ধান ছাড়া আর কয়টি ফসলের নাম বল?	৭। গম, ছোলা, আখ, ভূট্টা	৭। যথাযথ উদাহরণ
	৮। তোমার পড়া আরও কয়েকটি পশুপাখি সংক্রান্ত গল্পের নাম বল।	৮। টুনটুনি ও বাজার কথা শিয়াল ও আঙুর ফল	৮। যথাযথ দৃষ্টান্তগ্রহণ
	৯। শিয়াল, আলু, ধান শব্দগুলির ইংরেজি রূপ লেখ।	৯। শিয়াল — Jackal আলু — Potato ধান — Paddy	৯। যথাযথ দৃষ্টান্তগ্রহণ
	১০। পাঠ্যাংশ থেকে তোমরা কি শিখলে?	১০। বুদ্ধি যার বল তার।	১০। সাধারণীকরণ
	১১। আর কি শিখলে?	১১। কোনো কাজে সফল হতে গেলে সেই কাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। না থাকলে ঠকতে হয়।	১১। সাধারণীকরণ

শিশুকেন্দ্রিক পাঠ পরিচিতি করণ

ব্যবহৃত আচরণ সমূহ ঃ

১। শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ

২। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ

৩। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া

৪। শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

শ্রেণি — পঞ্চম | বিষয় — মাতৃভাষা

শিক্ষার্থীর সংখ্যা — | একক — ব্যাকরণ

শিক্ষকের নাম — | উপএকক — বিশেষ্য ও বিশেষণ

সময় — ৬ মিনিট

তারিখ —

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ / আচরণ	শিক্ষার্থীর কাজ / আচরণ	আচরণাঙ্গ
বিশেষ্য ও বিশেষণ	১। গোপাল তুমি বোর্ডে কয়টি শব্দ লেখ।	গোপাল ঃ ঠান্ডা, গরম, সুন্দর, হালকা (বোর্ডে লিখন)	শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ
	২। সোমনাথ তুমি ঐ শব্দগুলির মধ্যে একটি বেছে নিয়ে তা দিয়ে দুটি বাক্য লেখ।	ঠান্ডা ঃ (ক) এখন খুব ঠান্ডা (খ) এক গ্লাস ঠান্ডা জল দাও	ধারাবাহিকতা
	৩। প্রথম বাক্যে 'ঠান্ডা' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?	আবহাওয়ার কথা বলা হচ্ছে	ধারাবাহিকতা
	৪। ঠিক বলেছ। আচ্ছা, দ্বিতীয় বাক্যে 'ঠান্ডা' বলতে কি বোঝাচ্ছে?	দ্বিতীয় বাক্যে জলের তাপকে বোঝাচ্ছে	ধারাবাহিকতা
	আচ্ছা এবার আমি ২টি বাক্য লিখছি তোমরা আমাকে বোঝাও (ক) সাঁতার হল ভাল ব্যায়াম (খ) দোলা বিখ্যাত সাঁতারু	প্রথম বাক্যে 'সাঁতার' হল অবস্থার নাম। আর দ্বিতীয় বাক্যে 'সাঁতারু' হল অবস্থার ধরণ।	মিথষ্ক্রিয়ার ব্যবহার
	ঠিক বলেছ। তাহলে এই যে অবস্থা তার নাম হল 'বিশেষ্য' আর অবস্থার ধরণ হল 'বিশেষণ'	তাহলে স্যার, যে পদে কোন কিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন — রাম, ব্যায়াম, সাঁতার আর যে পদে কোন কিছুর অবস্থার ধরণ বোঝায় তাকে বিশেষণ বলে। যেমন — সুন্দর ফুল, নীল আকাশ।	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
	তাহলে তোমরা আজ কী শিখলে?	বিশেষ্য ও বিশেষণ কাকে বলে এবং উদাহরণ	সিদ্ধান্ত

শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিকাশের দক্ষতা

আচরণ সমূহ ঃ

১। শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ।

২। পুনরায় পর্যবেক্ষণ।

৩। শিক্ষার্থীদের দ্বারা কার্যকরণ সম্পর্কস্থাপন।

৪। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা।

শ্রেণি — তৃতীয় | বিষয় — মাতৃভাষা (বাংলা)

শিক্ষার্থীর সংখ্যা — | একক — 'নৌকোযাত্রা'

শিক্ষকের নাম — | — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সময় — ৬ মিনিট | "মধু মাঝির .... তেরো নদীর পার"

তারিখ —

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ / আচরণ	শিক্ষার্থীর কাজ / আচরণ	আচরণাঙ্গ
মধু মাঝির	১। তুমি এবার পূজোর ছুটিতে কোথায় কিভাবে বেড়াতে গিয়েছিলে?	১। আমি বাবা ও মায়ের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা প্রথমে ট্যাক্সিতে হাওড়া এবং তারপর ট্রেনে পুরী স্টেশন। সেখান থেকে অটোতে করে হোটেলে গিয়েছিলাম।	শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন
তেরো নদীর পার	২। ট্রেন ছাড়া আর কিভাবে বেড়াতে যাওয়া যায়?	২। বাস, উড়োজাহাজ, জাহাজ বা নৌকাতে করে ও বেড়াতে যাওয়া যায়	পুনরায় বিশেষ পর্যবেক্ষণ
	৩। আচ্ছা, নৌকা বা বোট কত রকমের হতে পারে?	৩। দু'রকমের — পাল তোলা আর মোটর চালিত বোট	শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন
	৪। মোটর বোট অন্য নৌকার চেয়ে কেন দ্রুত চলে বলতে পারবে?	৪। হ্যাঁ, মোটর বোট যন্ত্রের সাহায্যে চলে, তার বেগ ইচ্ছামত বাড়ানো যায় তাই।	৪। শিক্ষার্থীদের দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন।
	৫। অন্য সব নৌকা কীভাবে চলে?	৫। অন্য নৌকা পাল তুলে বা দাঁড় টেনে চলে। অনেক সময় আবার স্রোতের টানেও চলে।	৫। অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান
	৬। তোমার পাঠ্যাংশের 'নৌকাযাত্রা' কবিতাটির বিষয়বস্তু কি?	৬। ছেলে তার মাকে নিজের ইচ্ছের কথা বলছে — সে তার আর দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সোনা মানিক ভরা পাল তোলা নৌকায় চড়ে রাজপুত্রের মত সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে নতুন রাজার দেশ থেকে ঘুরে এসে মায়ের কোলে বসে সেই সব গল্প বলবে।	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও বিচার দক্ষতার বিকাশ সাধন ও বর্ণনাকরণ।

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ / আচরণ	শিক্ষার্থীর কাজ / আচরণ	আচরণাঙ্গ
	৭। তোমার পাঠ্যাংশের 'পর্যটন' কবিতার কেষ্টবাবু, বিষ্টুবাবু ও মহেশ্বর কে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন?	৭। কেষ্টবাবু বাদকশান, বিষ্টুবাবু মোসাম্বা এবং মহেশ্বর সান্টাকেতে বেড়াতে গিয়েছিল।	৭। অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান
	৮। এইসব দেখেশুনে লেখকের কি ইচ্ছা হয়েছিল?	৮। লেখকের কেষ্ট, বিষ্টু, মহেশ্বরের মতো বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল।	৮। পর্যবেক্ষণ ও বিচার দক্ষতার বিকাশ সাধন।
	৯। কিন্তু লেখক দূরে কোথাও বেড়াতে যেতে পারলেন না কেন?	৯। লেখক দূরে কোথাও যেতে পারলেন না, কারণ তাঁর কাছে বেশি টাকা ছিল না	পর্যবেক্ষণ ও কার্য কারণ সম্পর্ক স্থাপন
	১০। তাহলে আমরা এই পাঠ থেকে কী জানলাম	১০। কল্পনা ও স্বপ্নই দেশভ্রমণের মূল চাবিকাঠি।	১০। পর্যবেক্ষণ ও নিজের ভাষায় বর্ণনাকরণ।

শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক প্রশ্নকরণ

ব্যবহৃত আচরণ সমূহ ঃ

১। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ

২। প্রশ্নকরণের নমনীয়তা

৩। প্রশ্নকরণের পরিমিতিবোধ

৪। বিষয়কেন্দ্রিক বা মূল বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

শ্রেণি — তৃতীয় বিষয় — মাতৃভাষা (বাংলা)

শিক্ষার্থীর সংখ্যা — একক — 'গাছেরা কেন চলাফেরা করে না'

শিক্ষকের নাম —

সময় — ৬ মিনিট

তারিখ —

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ / আচরণ	শিক্ষার্থীর কাজ / আচরণ	আচরণাঙ্গ
অনেক অনেক .... বুঝিয়ে বলতে হবে না	১। গাছেরা প্রাণ থাকলেও অন্য প্রাণীদের সঙ্গে গাছের তফাৎ নিয়ে কি প্রশ্ন হতে পারে? হ্যাঁ, ঠিকই প্রশ্ন করেছ। অন্য প্রাণীর মতো গাছ চলাফেরা করে না।	১। মানুষ সহ সব প্রাণীই তো চলতে পারে। গাছ কি তা পারে?	শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ।
	২। চলাচল না করলেও গাছ অনেক কাজ করে। রমা, এ নিয়ে কি প্রশ্ন করা যায়? বা ঃ ভালো প্রশ্ন করেছ। গাছ আমাদের অনেক কাজে লাগে	২। রমা, গাছ আমাদের কি কাজে লাগে?	প্রশ্নকরণের নমনীয়তা

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ / আচরণ	শিক্ষার্থীর কাজ / আচরণ	আচরণাঙ্গ
	৩। এই বিষয় নিয়ে আর কে কি জানতে চাও? বাঃ খুব ভালো প্রশ্ন, আমাদের খাদ্য, বস্তু, বাসস্থান-সবই আমরা গাছের কাছ থেকে পাই। তাই গাছ আমাদের বন্ধু তো বটেই।	৩। সাক্ষীঃ গাছকে কি মানুষের বন্ধু বলা যায়	মূল বিষয়কেন্দ্রিক প্রশ্ন
	৪। আর কারো কোন প্রশ্ন আছে? ভালো প্রশ্ন করেছো। গাছ-পশু পাখিদের আশ্রয় দেয় এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন যোগায়।	৪। বরুণঃ গাছ আমাদের অনেক উপকার করে। অন্য প্রাণীদের কোন উপকার করে কি?	শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ
	৫। প্রবীর, এবার কি প্রশ্ন করা যেতে পারে? হ্যাঁ একেবারে ঠিক। মানুষের বাচার জন্যও অক্সিজেন গাছের কাছ থেকে পাওয়া যায়।	৫। প্রবীর ঃ স্যার মানুষের বাঁচার জন্যও তো অক্সিজেন প্রয়োজন, তাও কি গাছের থেকে পাওয়া যায়?	প্রশ্নকরণের নমনীয়তা
	৬। যতীন, তোমার কোন প্রশ্ন আছে? সত্যকথা বলতে কি গাছ মানুষের আরো অনেক কাজে লাগে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হল — গাছ ওষুধ তৈরীর কাজে লাগে।	৬। যতীন ঃ হ্যাঁ স্যার অক্সিজেন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের যোগান দেওয়া ছাড়া গাছ আর কি কোনো কাজে লাগে।	বিষয়কেন্দ্রিক প্রশ্ন
	৭। আর কেউ কোন প্রশ্ন করবে? ভালো প্রশ্ন করেছ। বিচার বিবেচনা না করে গাছ কাটা একেবারেই অনুচিত।	৭। রিমি ঃ গাছ যখন আমাদের এত কাজে লাগে তখন আমাদের কি উচিত যখন তখন গাছ কেটে ফেলা?	শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ
	৮। বিষয়টাকে আরো একটু ভালো করে বোঝার জন্য কি প্রশ্ন করবে তপন? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। তোমরা যখন ব্যাপারটা জানলে তখন তোমাদের সকলকে সচেতন করা যথাসম্ভব গাছকাটা বন্ধ করে আরও গাছ লাগাতে হবে।	৮। তপন ঃ স্যার, এ ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করার আছে?	প্রশ্নকরণের পরিমিতিবোধ

৫.৩.২.২. বৃহৎ পাঠটীকা বা বিস্তৃত পাঠটীকা ঃ

শিক্ষক বৃহৎ পাঠটীকা প্রস্তুতির পূর্বে 'শিক্ষার্থী', 'একক', 'শিক্ষণ পদ্ধতি'র বর্তমান অভিমুখ সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত হবেন। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এর নির্দেশ অনুযায়ী শিশুর জ্ঞান নির্মাণ হয় কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যথা —

(১) নিরীক্ষণ (Observation)

(২) পূর্ব জ্ঞানের আলোকে সূত্রস্থাপন (Contextualixation)

(৩) জ্ঞানগত শিক্ষানবীশ (Cognitive apprenticshih)

(৪) সহযোগ (Collaboration)

(৫) নির্মিতি (Interpretation construction)

(৬) বহুমুখি বিচিত্র ব্যাখ্যা (Multiple interfectation)

(৭) বহুমুখি ও বিচিত্র উপস্থাপনা (Multiple Manifestation)

একটি বৃহৎ পাঠটীকা সম্পূর্ণ একটি শিক্ষণ শিখনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

কর্মপত্রসহ একটি সপ্তম শ্রেণির পাঠ্য কবিতার পাঠটীকা করা হল।

(খ) দেয়ালের ছবি এঁকেছিল (শিকারি / শিকারির বাবা / বাঘ / শিকারির ঠাকুরদা)

(গ) বনের পশুপাখিরা শিকারিকে (ভালোবাসত / ঘৃণা করত / ভয় পেত / উপহাস করত)

(ঘ) শিকারি বাঘকে খেতে দিয়েছিল (গরম দুধ / মাংস / ঠান্ডা জল / চা)

২। এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরী কর ঃ

ন ক নে দি অ, ম ব স য় স, ল দে য়া, র অ ম ক ন্য, ম ম ছা ছি

৩। বর্ণ বিশ্লেষণ করো ঃ

অনেকক্ষণ, পরিষ্কার, কথাবার্তা, অন্যরকম, নেকড়ে

৪। গল্পের ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো ঃ

(ক) শিকারি খুব মজা পেয়েছে।

(খ) বাঘ হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে ঘরের দেয়ালে একটা হাতে আঁকা ছবি দেখতে পেল।

(গ) বাঘ বলল, ... বন্ধুর বাড়ি যাব তাতে আর আপত্তি কী!

(ঘ) বাঘ ঘরে ঢুকে মাটির ঠান্ডা মেঝেয় বসে পড়ল।

(ঙ) বাঘ বলল, ... তা এটা কি মানুষের আঁকা?

৫। শব্দ যুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও ঃ

তির	বাড়ি	জিভ	হতো
তীর	বারি	জীব	হত

নমুনাপত্র - ১

শ্রেণি — চতুর্থ

একক — আলো

১। ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভের মেলাও ঃ

ক	খ
মনসাঝোপ	ভয়
বন	ভাত
অন্ধকার	গুরুমশায়
পাঠশালা	গাছপালা
হাঁড়ি	কাঁটা

২। পাশের শব্দ ঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো ঃ

(ক) বুড়ো দাদু অসাড় _____ হয়ে পড়ে থাকে।

(খ) হাতের তলায় _____ শিশি খুঁজে পায়।

(গ) পাতার ফাঁক দিয়ে _____ বয় শোঁ শোঁ।

(ঘ) করাল _____ ধারালো ভারি।

(ঙ) দূরে দূরে খানকতক _____।

শব্দঝুড়ি
মধুর, কঠিন, বাতাস, মনসাঝোপ, অচেতন

৩। নীচের বর্ণগুলি কোনটি কী তা পাশে ‘√’ চিহ্ন দিয়ে বোঝাও ঃ

বর্ণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অঘোষ	সঘোষ
ক				
গ				
চ				
ত				
থ				
ব				
প				
ন				

৫.৩.৪. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সমূহের শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বাস্তবটিকে শিশুর মনে পৌঁছে দেবার জন্য বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ শিশুর কানে শুনে ও চোখে দেখে শেখার উপযোগিতা মেনে নিলেও সব সময় বাস্তব জিনিসটি শিক্ষার্থীর সামনে হাজির করা যায় না। এই অবস্থায় শিক্ষক বিকল্প জিনিসের সাহায্য নেন। ফলে শিক্ষণীয় বিষয় শিশুর কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে।

উদ্দেশ্য ঃ

- শিশুর কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করা
- শিক্ষণীয় বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করা
- শিক্ষণীয় বিষয় পাঠদান যাতে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে তাতে নজর দেওয়া
- শ্রেণি উপযোগী উপকরণ ব্যবহার করা

- পিছিয়ে পড়া শিশুরাও যাতে স্বচ্ছ ধারণা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা
- ভাষা শিক্ষার গঠনগত, বিষয়গত ও ভাবগত দিকগুলিকে সহজ, সুন্দর ও বোধগম্য করে তোলা।

ধারণা ঃ

যে সব বস্তু ব্যবহার করলে শিশুদের কল্পনাশক্তিতে উদ্দীপিত এবং মনোযোগী করে তোলা সম্ভব হয় ও তাদের শিক্ষণীয় বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলা যায় তাকেই শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বলে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক উপকরণগুলি হবে বিষয় বস্তু অনুসারে, শ্রেণি উপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষা সহায়ক উপকরণের বৈশিষ্ট্য ঃ

- নীরস, জটিল বিষয়বস্তুকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে।
- বিমূর্ত বিষয় মূর্ত হয়ে ওঠে।
- বাস্তব অভিজ্ঞতা উপকরণ দেখে সমৃদ্ধ হবে।
- চিন্তাশক্তি জাগ্রত করা ও মনকে যুক্তিনির্ভর করে।
- পাঠদান কাজেও উৎকর্ষ সাধন করে।
- বিষয় উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে।

শিক্ষা সহায়ক উপকরণের তাৎপর্য ঃ

- শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্যে চোখ ও কান এই দুই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাদের অবদান শিশুর মনে পৌঁছে দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা হয়।
- শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলা যায়।
- উপকরণের ব্যবহারে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিশু সহজেই ধারণা করতে পারে।
- একটি বাস্তব পরিবেশ গড়ে ওঠে।
- উপকরণের ব্যবহার শিশুর মধ্যে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে। শিশুদের আবেগ প্রশমিত হয় ও জ্ঞান গভীর হয়।

প্রকারভেদ ঃ

চোখ ও কান দুটি ইন্দ্রিয় মাধ্যম হওয়াতে উপকরণগুলিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করতে পারি।

(ক) দর্শন নির্ভর উপকরণ

(খ) শ্রবণ নির্ভর উপকরণ

(গ) দৃশ্যশ্রাব্য উপকরণ

উপকরণ শিখন প্রক্রিয়া ঃ

বর্তমানে Teaching learning material বা সংক্ষেপে TLM শব্দটি ভাষা শিক্ষায় বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষা উপকরণ শিক্ষক নিজে তৈরি করবেন এবং শিশুদের দিয়ে তৈরি করাবেন। ফলে নিজের তৈরি করা উপকরণ ব্যবহার করে আধিপত্যের সঙ্গে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিশুদের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারবেন।

- নিজের তৈরি উপকরণ কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সহজ।
- প্রয়োজন হলে পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজন করতে পারবেন।
- শিশু তার নিজের তৈরি উপকরণ ব্যবহৃত হতে দেখলে পাঠে আগ্রহী হবে ও আনন্দ লাভ করবে।
- নিজের তৈরি বলে উপকরণ ব্যবহারে মমত্ব ও আন্তরিকতা থাকবে।
- বহু উপকরণ সৃজনের আনন্দ প্রদান করতে পারবে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকরণের গুরুত্ব ঃ

ভাষা শিক্ষার গঠনগত, বিষয়গত ও ভাবগত দিকগুলিকে উপকরণের সাহায্যে নিম্নলিখিত উপায়ে সহজ ও সুন্দরভাবে বোধগম্য করে তোলা যায়। যেমন

- ভাষা শিক্ষার প্রথম দিকে বর্ণ ও শব্দ চেনানোর ক্ষেত্রে চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ড, প্যাকেট বোর্ডের সাহায্যে সহজভাবে সক্রিয়তা ও বোধগম্যতা বজায় রেখে পাঠদান সম্ভব।
- আদর্শ লিখন সমন্বিত চার্ট দেখে-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুন্দর হাতের লেখা অভ্যাস করতে পারবে।
- বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্য বিষয় সম্বলিত চার্ট-ছবি-মডেল ব্যবহার করা যায়।
- তবে মনে রাখতে হবে উপকরণের বাহুল্যে আসল বিষয়বস্তু চাপা পড়ে না যায় তার জন্য শ্রেণির উপযোগী উপকরণ হতে হবে ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে।
- আদর্শ কথনের জন্য বা আবৃত্তি কিংবা গদ্যপাঠ-এর ক্যাসেট বা সিডি ব্যবহার করা যায়। ফলে শিশুর উচ্চারণ স্পষ্ট হবে, সুন্দরভাবে বলতে শিখবে।
- অন্যান্য শ্রেণিতেও বিষয়ানুগ ছবি, চার্ট, মডেল যেমন — পাহাড়ের নীচে হাট, হাটের ছবি, লেখকের কিংবা কবির ছবি, ‘‘বাঁশের কেল্লা’’ মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করলে পাঠদান চিত্তকর্ষক ও আনন্দদায়ক হবে।

দর্শন নির্ভর উপকরণ সমূহের শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি

চার্ট : তথ্য সম্বলিত ছবিকে চার্ট বলে।

- চার্ট একটি সহজ ও দ্বিমাত্রিক শিক্ষা উপকরণ। চোখ ও কান এই দুই ইন্দ্রিয়ের কাজ একসঙ্গে হয় বলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ সহজ ও দৃঢ় হয়।
- পাঠদানে বৈচিত্র্য আসে।
- যুক্তি ও বিচার ক্ষমতা বাড়ে, নতুন বিষয়ে আগ্রহী হয়। দীর্ঘস্থায়ী উপকরণ হিসাবে এটি বহুবার ব্যবহার করা যায়, সহজে রাখার ব্যবস্থা করা যায়।
- চার্টের মাধ্যমে পাঠদানে শিশুকে সক্রিয় করে তোলা যায়, সৃষ্টিধর্মিতা বাড়ে এবং অল্পসময়ে বিষয়বস্তু বোঝানো যায়।

চার্ট তৈরির পদ্ধতি

- চার্ট আকারে বড় হবে যাতে সকল শিক্ষার্থী দেখতে পায়।
- বোঝার সুবিধার জন্য প্রয়োজনমত মোটা হরফে লিখতে হবে, রং ব্যবহার করা হবে।
- চার্টের বিষয়বস্তু হবে স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে লেখা থাকবে।
- দর্শন নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ চার্ট, তাই ছবি ও লেখাগুলি যথাসম্ভব বড় হবে।
- শিক্ষার্থীরাও চার্ট তৈরিতে অংশগ্রহণ করবে।

চার্ট কিভাবে ব্যবহৃত হবে ঃ

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী দেখতে পায় এমন জায়গায় টাঙাতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চার্ট ব্যবহার করা উচিত নয়। নির্দেশক দন্ড দিয়ে চার্ট নির্দেশ করতে হবে।
- প্রদর্শন হয়ে গেলে চার্ট গুটিয়ে বা ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। এটি একটি উপকরণ মাত্র। তাই বিষয়বস্তুর অপেক্ষা চার্টের প্রদর্শন বেশী গুরুত্ব পাবে না। চার্টের ব্যবহার পরিমিত ও পাঠোপযোগী হবে। ‘‘চক্রচার্ট’’–ও বর্তমানে ব্যবহার করা হয়। এগুলি কিনতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনে শিশুরা তৈরি করে নিতে পারে।

মডেল ঃ

মডেল হল একটি জিনিসের যথাসম্ভব সঠিক অনুভূতি। ছবির চেয়েও মডেল বস্তুটিকে বাস্তব আকার দেয় কারণ এটি ত্রিমাত্রিক।

শিক্ষণীয় বস্তু খুব বড় বা খুব ছোট বা জটিল হলে সেগুলিকে শ্রেণি কক্ষে আনা যায় না। সেক্ষেত্রেও মডেল ব্যবহার করে কাজ চালানো যায়। মডেল দৃশ্যনির্ভর উপকরণ।

প্রস্তুতিকরণ ঃ মডেল তৈরির সময় নিম্নলিখিত দিকে নজর দিতে হবে —

- প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা দরকার।
- প্রদর্শন উপযোগী আকার হতে হবে।
- বহনযোগ্যতার কারণে মডেলটি শক্ত ও মজবুত হতে হবে।
- মাটি, কাঠ, পিচবোর্ড, থার্মোকল ও নানা জিনিস দিয়ে মডেল তৈরি করা যায়। শিক্ষক নিজে এবং শিক্ষার্থীদের সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের তৈরি মডেলগুলির শিক্ষামূলক প্রদর্শনী করার জন্য সংরক্ষণ করা হবে।
- মডেল দর্শন নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ফলে বিষয়বস্তুর গভীরে যেতে পারে।

প্রদর্শন কীভাবে হবে ঃ

- শ্রেণিকক্ষে মডেল ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রদর্শনের সময় সকলে যেন দেখতে পায়।
- নির্দেশক দন্ড ব্যবহার করে মডেল প্রদর্শিত হবে।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় প্রদর্শন করা যাবে না।
- প্রদর্শন হয়ে গেলে মডেলটি ঢেকে রাখতে হবে কারণ শিশুদের মনোযোগ পাঠ এর বিষয়বস্তু থেকে সরে গিয়ে মডেলে দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ থাকবে।

ব্ল্যাকবোর্ড ঃ

- যে স্কুলে কোন উপকরণ নেই সেখানেও একখানা ব্ল্যাকবোর্ড থাকবেই। বোর্ড সর্বজন পরিচিত একটি অত্যাবশ্যক অপরিহার্য উপকরণ। শ্রবনেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহারে বিষয়বস্তু ছাত্রদের মনে গাঁথা হয়ে যায়।
- পাঠদানকালে নতুন বিষয়ের নাম, গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিভিন্ন বর্ণ, সংক্ষিপ্ত উত্তর, ব্যাকরণ ইত্যাদি নানা বিষয় বোর্ডে লেখা যেতে পারে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয় বাড়ানোর জন্য তাদের বোর্ড ব্যবহার করতে বলা যেতে পারে।
- সাধারণত বোর্ডে সাদা চক দিয়ে লেখা হয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশ রঙীন চক ব্যবহার করে লিখলে সেই অংশে বিশেষভাবে শিশুর নজর পড়বে।

বোর্ডের ব্যবহার কেমন হবে ঃ

- সব সময় পরিষ্কার থাকবে।
- বোর্ডের কাজ হয়ে গেলে বোর্ড মুছে দিতে হবে।
- বোর্ডের লেখা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হবে।
- বোর্ডের লেখা সংক্ষিপ্ত হবে।
- শিক্ষক বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে লিখবেন।
- বোর্ডের লেখা হবে ধারাবাহিক।
- শিক্ষক বোর্ডের লেখা প্রদর্শনের সময় নির্দেশক দন্ড প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন।
- বোর্ডের যথাযথ ব্যবহার পাঠদানকে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

পকেট বোর্ড ঃ শিক্ষোপকরণগুলির পাশাপাশি নবতর সংযোজন হল পকেট বোর্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, ইংরাজী পঠন পাঠনে পকেট বোর্ড ম্যাজিক বোর্ড হিসাবে কাজ করতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ এটি কাপড়ের তৈরি বোর্ড। এতে বামদিকে ডানদিকে ১২টি এবং উপর নীচে মোট ১০টি পকেট থাকবে। পকেটগুলিতে ৫৪মাপের কার্ড আটকানো যাবে।

১২০টি পকেটওয়ালা বোর্ড তৈরির জন্য ২মিটার ৫৬মাপের একখন্ড সাদা কাপড়ও থাকবে। কাপড়ের মান ভাল হতে হবে।

- কার্ডগুলি বিভিন্ন রঙের হবে। রঙ দেখলে বিষয় চেনা যাবে। বর্তমানে ৫টি রং ব্যবহার হচ্ছে। যেমন

(১) সাদা — বর্ণমালা কার্ডের জন্য

(২) হলুদ — গণিতের সংখ্যা ও চিহ্নের জন্য

(৩) সবুজ রং — ভাষা শিক্ষার জন্য

(৪) আকাশী নীল রং — পরিবেশের গাছপালা, পশু পাখি আঁকার জন্য

(৫) গোলাপী রং — নাম লেখার জন্য, গণিতের ছবি আঁকার জন্য

- কার্ডে লেখার জন্য পোস্টার কালি ও তুলি ব্যবহৃত হবে। সব লেখা একই ধরনের হবে। সুন্দরভাবে গোটা গোটা করে লিখতে হবে। কার্ডগুলি বোর্ড পেপার কেটে তৈরি করতে হয়।
- কার্ডগুলি সংরক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষে সুশৃঙ্খলাভাবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ বোর্ড প্রয়োজন। প্রস্তুত প্রণালী পকেট বোর্ডের মতন।

পকেট বোর্ড ব্যবহারের উপকারিতা ঃ

- শিক্ষকের পরিশ্রম কমায়
- সময়ের সাশ্রয় হয়
- শিক্ষণ দ্রুত ও উন্নতমানের হয়
- উৎপাদন বেড়ে যায়

তবে অসুবিধা হলো শিক্ষার্থীদের চেনা ও পড়ার দক্ষতা অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হলেও পকেট বোর্ড লেখার নৈপুণ্য অর্জনে বিশেষ কার্যকরী হয় না।

শ্রুতিনির্ভর উপকরন সমূহ ঃ

রেডিও

শ্রুতি নির্ভর সহায়ক উপকরণ। শিক্ষার্থীর আসর, শিশুমহল, বিভিন্ন শিক্ষামূলক, পন্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা পঠন পাঠনে সাহায্য করে।

টেপরেকর্ডার

শ্রুতিনির্ভর উপকরণ। শিক্ষার্থীদের পড়া রেকর্ড করিয়ে তাদের ভুল দেখিয়ে দেওয়া উচ্চারণ শুদ্ধি, কবিতা আবৃত্তি, আরো নানা কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দৃশ্য শ্রাব্য উপকরন সমূহ ঃ

গ্রামোফোন

শ্রুতি নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ। এর ব্যবহার পুরোপুরি শিক্ষামূলক হবে। রেকর্ডগুলিও শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর হবে।

চলচ্চিত্র

সচল ও সবাক চিত্র শিশুর কাছে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে। তার শিক্ষাগত মূল্য অসীম। শিক্ষা বিভাগ যদি শিক্ষামূলক তথ্য চিত্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে তাহলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে। এটি দর্শন ও শ্রুতি নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ।

টেলিভিশন ঃ

দর্শন ও শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষায় আবেদন রাখে। টেলিভিশনে শিক্ষামূলক কার্যক্রমগুলো শিশুদের জন্য উপযোগী।

সিডি ও সিডি প্লেয়ার ঃ

দর্শন ও শ্রুতিনির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এই উপকরণগুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে সিডিতে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম অর্ন্তভুক্ত করে সিডি প্লেয়ারের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে।

কম্পিউটার ঃ

কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত পাঠগুলো যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা-পরিকল্পনা করে সাজিয়ে গুছিয়ে করা হয়ে থাকে। ফলে ঐ পাঠের সবকটি শিক্ষামূলক সামর্থ্য পূরণ হয়। এছাড়া প্রয়োজনে পাঠটি পুনরায় একইভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনে পূর্বের পাঠদান করা দৃশ্যগুলি দেখে নিয়ে পরবর্তীকালে পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। বর্তমানে শিক্ষাবিভাগ এই উপকরণটির উপর জোর দিচ্ছেন। এগুলি অগ্রগতির সহায়ক। সেজন্য শিক্ষাবিভাগ থেকে এই উপকরণগুলি সব বিদ্যালয়ে সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৫.৩.৫. স্বল্পমূল্যের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত করণ ঃ

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান ব্যবস্থাতেও এসেছে পরিবর্তন। আর এই শিক্ষাদানকালে উপকরণ ব্যবহার আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করা হয়। সেই জন্য নানা ধরনের উপকরণের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমাদের আলোচ্য স্বল্পমূল্যের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রস্তুতকরণ।

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে, যেগুলি আমরা সাধারণত কোনো কাজে লাগাই না। কিন্তু বুদ্ধির একটু প্রয়োগ ঘটিয়ে সেইসব বস্তুগুলি থেকে আমরা খুব সহজেই শিক্ষাসহায়ক উপকরণ (TLM) তৈরী করতে পারি। এতে একদিকে যেমন খরচ কম হবে, অন্যদিকে তেমনি আবার অব্যবহৃত জিনিসগুলি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে; সেই সঙ্গে শিশুর হাতে কলমে কাজ শেখানো বা ব্যবহারিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠন প্রক্রিয়াকেও আনন্দদায়ক ও সক্রিয়তাভিত্তিক করা সম্ভব হবে।

ভাষা সাহিত্য পড়াবার জন্য ফেলে দেওয়া সামগ্রী বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ কিনে খুব ভালো চার্ট কিংবা মডেল তৈরী করা যায় যা দিয়ে সহজে ব্যাকরণ শেখানো যেতে পারে; গল্প কিংবা পরিবেশের পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে কিংবা মূল্যায়নের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষার জন্য এইসব উপাদান তৈরীতে আর যা যা উপকরণ লাগে তা হল আবেগ, বুদ্ধি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। এই সমস্ত উপকরণ চিন্তা ভাবনা ও জানার আগ্রহ বাড়াবে, অন্যদের সাথে ভাব বিনিময় করার মতো ক্ষমতা তৈরী করবে।

ফ্ল্যাশকার্ড — প্রথম শ্রেণিতে ফ্ল্যাশকার্ড ব্যবহার করে কোনো বিষয়ের ছবি নাম, শব্দ বর্ণ ইত্যাদি শেখানো যায়। আবার গল্প কবিতা ছড়া পাঠদান কালেও ফ্ল্যাশকার্ড ব্যবহার করা যায়। এই কার্ড বানানো যায় শক্ত বা পাতলা যে কোনো কার্ডবোর্ড চৌকো করে কেটে তাকে সাদা কাগজ সেঁটে তার ওপর শিক্ষনীয় বিষয়টি আঁকতে কিংবা লিখতে হবে।

পুতুল — পুতুল বিভিন্ন জিনিস দিয়ে বানানো যায় — (১) মাটির পুতুল (২) মোমের পুতুল (৩) প্লাস্টিক বল দিয়ে (৪) ডিমের খোলা দিয়ে (৫) ছেঁড়া কাপড় বা তুলো দিয়ে (৬) দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে (৭) থার্মোকল দিয়ে। 'সত্যি সোনা' গল্পটি পাঠদানকালে পুতুলের ব্যবহার করা যেতে পারে।

মডেল — মাটি কিংবা পাটকাঠি দিয়ে খুব সহজেই মডেল তৈরি করা যায়। বিষয় অনুযায়ী মাটি দিয়ে সহজে মডেল তৈরি করে তা শুকিয়ে দিয়ে পাঠদানকালে ব্যবহার করা যায়। পাটকাঠি দিয়ে মডেল তৈরির সময়ে আঠা ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছবি/চার্ট — পুরানো ক্যালেন্ডারের পাতার পিছন দিকের ফাঁকা অংশটিতে ছবি আঁকা যেতে পারে। এছাড়াও চার্ট তৈরির কাজেও সেটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া পুরানো খবরের কাগজ কিংবা ফেলে দেওয়া বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রের সোনালি অংশ ব্যবহার করে কোলাজের কাজ করা যেতে পারে।

মুখোশ — খবরের কাগজ দিয়ে মুখোশ তৈরি করা যেতে পারে। তাছাড়া তালের আঁটি কিংবা আমের আঁটি দিয়ে বাঘের মুখ কিংবা বক, ময়ূর ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে।

৫.৪. সারসংক্ষেপ ঃ

শ্রেণি শিক্ষাদানে পাঠ পরিকল্পনা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে অনুপাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অনুপাঠের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিভিন্ন দক্ষতাতে পারদর্শী হয়ে ওঠে। শিখনের ক্ষেত্রে কর্মপত্র, উপকরণের ভূমিকা ও যথেষ্ট। পাঠকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শিক্ষাসহায়ক উপকরণের ব্যবহার আবশ্যিক। তাছাড়া শিক্ষাসহায়ক উপকরণ আমরা খুব সহজেই স্বল্পমূল্যে তৈরী করতে পারি।

৫.৫ অনুশীলনী ঃ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) পাঠ পরিকল্পনা কাকে বলে?

(২) অনুপাঠ টীকা কি?

(৩) অনুপাঠ টীকার ধারণা কে দেন?

(৪) দুটি দৃশ্য শ্রাব্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণের নাম বলুন।

(৫) কর্মপত্র কি?

সংক্ষিপ্ত ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) পাঠপরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাগুলি লিখুন।

(২) অনুপাঠ টীকার চক্রটি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) শিক্ষাসহায়ক উপকরণ কি? বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখনে উপকরণের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাগুলি লিখুন।

(৪) স্বল্পমূল্যে কীভাবে শিক্ষাসহায়ক উপকরণ তৈরী করা যায় তা উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

পাঠটীকা

বিদ্যালয়ের নাম —

শ্রেণি — সপ্তম　　　　বিষয় — মাতৃভাষা (বাংলা)

গড় বয়স — ১২ বৎসর　　　　একক — বঙ্গভূমির প্রতি

সময় — ৪০ মিনিট/৪৫　　　　উপএকক — (ক) রেখো, মা, দাসেরে মনে...............পড়িলে অমৃত-হ্রদে।

তারিখ —　　　　(খ) সেই ধন্য নরকুলে,................. কি বসন্ত, কি শরদে !

আজকের পাঠ —

সাধারণ উদ্দেশ্য — শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক ধারণা গড়ে তোলা
শিক্ষার্থীদের ভাষা-জ্ঞান বৃদ্ধি
সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি

বিশেষ উদ্দেশ্য — মাতৃভাষার প্রতি, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অনুভব করানো
কবির বিভিন্ন রচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি

উপকরণ — ১। শ্রেণির সাধারণ উপকরণ
২। কবিতাটি আবৃত্তির রেকর্ড
৩। কবির জীবনী পঞ্জী
৪। বিভিন্ন কবিতার উল্লেখ সম্বলিত চার্ট

পাঠটীকাতে যে সময়ের উল্লেখ আছে — ১০+২৫+১০ = ৪৫।

আয়োজন স্তর					
বিষয় বস্তু	**শিক্ষকের ভূমিকা**	**যৌক্তিকতা**	**শিক্ষার্থীর মত বিনিময়**	**সময় জ্ঞান**	**শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া**
শ্রেণিসজ্জা, দলবিভাগ ও নামকরণ, পূর্বজ্ঞান-যাচাই এবং আজকের পাঠে আগ্রহ সঞ্চার —	শ্রেণিতে প্রবেশ করে কুশল বিনিময়ের পর পাঠদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করব। তারপর শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করে দেব এবং দলনেতা নির্দিষ্ট করে দেব। দলগুলির নাম হবে — কোকনদ, ইন্দিবর ও পুণ্ডরিক। এরপর ৪ নং উপকরণটি দেখিয়ে আজকের বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কতখানি পূর্বজ্ঞান আছে তা জানার জন্যে ও আজকের পাঠে মনোনিবেশ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করব। ১। তোমরা কোন কোন কবির ইংরাজী কবিতা পড়েছ? ২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কী কী কবিতা পড়েছ? ৩। কয় রঙের পদ্মফুলের কথা তোমরা জান ৪। মরণশীল প্রাণী কাদের বলে?	মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত করা।	প্রতিটি দল উপকরণ দেখে সক্রিয় ভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রতি দল থেকেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবে	১০ মিনিট	শিক্ষকের প্রতি সৌজন্য বজায় রেখে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া এবং অন্যান্য আচরণের দ্বারা কবিতা ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ পাবে।

পাঠঘেষনা ঃ- আজ আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের বঙ্গভূমির প্রতি কবিতীর আলোচনা করব/জানব।

উপস্থাপন স্তর					
বিষয় বস্তু	**শিক্ষকের ভূমিকা**	**যৌক্তিকতা**	**শিক্ষার্থীর মত বিনিময়**	**সময় জ্ঞান**	**শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া**
বঙ্গভূমির প্রতি কবি — মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'My Native Land, Good night.' —Byron রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে, / সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ, ... মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত হ্রদে!/	প্রথমে কবি, উৎস ও নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। এরপর উপকরণ (২) সহযোগে সকল শিক্ষার্থীকে আবৃত্তিটা শোনানো হবে। এরপর ৫ মিনিট কবিতাটি নীরবে পড়তে দেওয়া হবে। অতঃপর আজকের পাঠ্যাংশ থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে। ব্যাকরণগত দিকগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। ১। 'এ মিনতি করি পদে'— কবি কার কাছে কী প্রার্থনা জানিয়েছেন? ২। 'পরমাদ' শব্দটি কোন মূলশব্দ থেকে এসেছে? ৩। কবির নিজেকে বঙ্গভূমির দান বলার মধ্য দিয়ে তাঁর কোন মনোভাবের পরিচয় মেলে? ৪। 'মধুহীন কোরো না গো' — মধু শব্দটি কোন্ দুটি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে? চক বোর্ডের ব্যবহার ঃ-	মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী কবিতা ও অন্যান্য রচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি। তাঁর রচনা কৌশল ও ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি। জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও দায়বদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া।	শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে, প্রয়োজনে উপকরণের সাহায্য নিয়ে উত্তর দেবে। না বুঝতে অংশ থেকে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করে। ১। কবি জন্মভূমি মা-র কাছে প্রার্থনা করেছেন যে প্রবাসে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হলেও জন্মভূমি, দেশমাতা যেন তাঁকে মনে রাখেন। ২। 'প্রমাদ' থেকে এসেছে। ৩। এর মধ্য দিয়ে কবির জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও তা প্রকাশের পরিচয় মেলে। ৪। 'মধু' শব্দের একটি হল কবির নাম এবং আরেকটি হল মৌচাকের মধু	২৫ মিনিট	স্পষ্ট উচ্চারণে, যথাযথ ভাব প্রকাশ করে কবিতা বলতে পারবে। মাইকেল মধুসূদনের সৃষ্টি ও সৃষ্টিক্ষমতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগবে আর দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধ মনোভাব তার আচরণে প্রকাশ পাবে।

মূল্যায়ন স্তর					
এই স্তরে আজকের বিষয়বস্তু কতটা আয়ত্ব করতে পারল তা জানার জন্য কর্মপত্র দেওয়া এবং প্রয়োজনে উপকরণগুলোর সাহায্য নেওয়া।	শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে কর্মপত্র পূরণ করতে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময় শেষে কর্মপত্রগুলো ফেরত নিয়ে প্রয়োজনমত সংশোধন করে দেওয়া হবে।	আজকের পাঠ লব্ধ জ্ঞান উদ্দেশ্য ভিত্তিক হল কিনা তা জানা	শিক্ষকের নির্দেশ মতো শিক্ষার্থীরা কর্মপত্র পূরণ করবে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্মপত্র পূরণ করার পর তা শিক্ষককে ফেরত দেবে।	১০ মিনিট	শিক্ষার্থীরা মাইকেল বিভিন্ন রচনা করবে এবং তাঁর শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হবে।

সংশোধনী পাঠ ঃ- উত্তর পত্রগুলি মনোযোগ সহকারে দেখব। ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবো। প্রয়োজনে — পুনরায় পাঠদান করব।

কর্মপত্র

১। বিপরীত শব্দ লেখ — প্রবাস, মরণ।

২। গদ্যরূপ লেখ — কহ, জন্মিলে।

৩। শব্দার্থ লেখ — কোকনদ, মিনতি।

৪। দাগ দেওয়া শব্দগুলোর কারক বিভক্তি নির্ণয় করো —

(i) রেখো, মা, দাসেরে মনে।

(ii) এ দেহ আকাশ হতে

৫। প্রশ্নটির উত্তর দাও —

বঙ্গভূমির প্রতি কবি কি আবেদন করেছেন?

৫.৩.৩. সক্রিয়তাভিত্তিক কর্মপত্র রচনা ঃ

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০০৫) ও শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯) অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও শিশুকেন্দ্রিক ও জীবনকেন্দ্রিক করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্বাচিত বই, পাঠ্যসূচি ও কৌশলের বদল ঘটেছে। নবসজ্জায় ও নবকলেবরে প্রাথমিক শিক্ষার বইগুলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শিশুর সক্রিয়তার ওপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শ্রেণির মাতৃভাষা বাংলার জন্য নির্দিষ্ট বইগুলিতে প্রত্যেকটি এককের শেষে দেখা যায় যে হাতে কলমে অংশে নির্দেশ মতো কিছু কাজ করতে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি শিক্ষার্থীরা নির্দেশ অনুযায়ী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূরণ করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বোঝা যায় এবং এই কাজের মাধ্যমে তাদের একক সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান ও ধারণার উন্মেষ হয়। আর এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট পাতাকেই কর্মপত্র বলা হয়।

শিক্ষার্থী সাধারণত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কর্মপত্র সক্রিয়ভাবে পূরণ করে থাকে। তাই এই কর্মপত্রকে শিক্ষণের বিভিন্ন স্তরে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন আয়োজন স্তরে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার যাচাই করা যেতে পারে কর্মপত্রের মাধ্যমে। সেখানে তারা নির্দেশ অনুযায়ী কর্মপত্র পূরণ করে তাদের পূর্বজ্ঞান প্রকাশ করতে পারে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় উপস্থাপন স্তরে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রেখেই শিক্ষাকার্যে শিক্ষক সহায়তা করে থাকেন। এই ব্যবস্থায় বিষয়বস্তুর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই তা অনুধাবনের জন্য

বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখে অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্মপত্র ব্যবহার করতে পারেন। অভিজ্ঞ শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণে এই স্তরে কর্মপত্রের ব্যবহার শ্রেণির ধারাবাহিকতার পরিপন্থী হবে না। তবে সক্রিয়তাভিত্তিক কর্মপত্র বেশি কার্যকরী ও জনপ্রিয় মূল্যায়ন স্তরে। সক্রিয়তা ভিত্তিক কর্মপত্রের মাধ্যমে বোধগম্যতা অর্থাৎ বিষয়কেন্দ্রিক তাৎক্ষণিক জ্ঞানের যাচাই করা যায়। এখানে শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়ে অংশ গ্রহণ, সহযোগিতা ও সৃজনশীলতার মূল্যায়ন হয়ে যায়।

নীচে কর্মপত্রের নমুনা দেওয়া হল—

নমুনাপত্র - ১

শ্রেণি — তৃতীয়

একক — দেয়ালের ছবি

১। বন্ধনীর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে লেখো ঃ

(ক) গল্পের বাঘটি ভালো (গান গাইত / গল্প বলত / ছবি আঁকত / কথা বলত)

অধ্যায়

৬

ব্যাকরণ শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

৬.১. সূচনা

আজও অনেক পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় ব্যাকরণের সংজ্ঞা হিসাবে লেখা হয় — 'যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমরা ভাষা বলতে লিখতে শিখি।' অথচ ভেবে দেখা হয় না যে শিশু তার মাতৃভাষা জন্মাবার পর থেকে রপ্ত করে এবং যখন সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন মাতৃভাষায় গুছিয়ে কথাও বলতে পারে। ভাষা মানুষ অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করে। তাতে তার দৈনন্দিন কাজ চলে যায়। কিন্তু ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ জ্ঞান জরুরী হয়ে পড়ে। যেমন দুই বন্ধু পথ চলছিল হঠাৎ একজন চিৎকার করে বলল 'সাপ'। অন্যজন চমকে পিছনে সরে এলো। একজন অন্যজনকে সাবধান করতে তার মনের ভাব প্রকাশ করল অভ্যাসবশত অন্যজন তাতে সাড়াও দিল কিন্তু দুজনের কেউই হয়তো লক্ষ্য করল না যে 'তোমার সামনে সাপ; সাবধান' এই বাক্যটি সংকুচিত হয়ে গেছে এখানে। অর্থাৎ বন্ধু যে একটি পূর্ণবাক্যই ব্যবহার করেছে তা সে বুঝতে পারলো না। 'ব্যাকরণ' (বি-আ-কৃ+অন) শব্দের আক্ষরিক অর্থও 'বিশেষ ও সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করা।' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাই লিখেছেন 'যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে, বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে, লিখনে ও কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে ভাষার ব্যাকরণ বলে।"

যদিও বাঙালি সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ লেখেনি। পোর্তুগিজ পাদরি মনোএল-দা-আসসুম্পসাও (Manoel da Assumpsam) ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন বা লিসবোয়াঁ শহর থেকে প্রথম রোমান হরফে 'Vocabulario eun Idioma Bengalla' প্রকাশিত হয় বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। রোমান হরফে হলেও সেই প্রথম কোনো বাংলা শব্দ মুদ্রিত হয়। এরপর ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড A grammar of the Bengali Language প্রকাশ করেন ইংরেজি ভাষায়। যদিও তাতে শ্রীরামপুর প্রেসে পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি বাংলা হরফের ব্যবহার হয়েছিল।

প্রথম বাঙালি হিসাবে রাজা রামমোহন রায় ইংরাজিতে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ব্যাকরণ লেখেন পরে তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে তা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে অনেক ভাষা বিজ্ঞানী তাঁদের মৌলিক চিন্তায় বাংলা ব্যাকরণকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল হাই, সুকুমার সেন প্রমুখ। বর্তমানে পবিত্র সরকার, পরেশচন্দ্র মজুমদার, রামেশ্বর শ, প্রবাল দাশগুপ্ত প্রমুখ ভাষা বিজ্ঞানীরা বাংলা ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণা করে চলেছেন।

৬.২. উদ্দেশ্য

- আলোচ্য অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী ব্যাকরণ শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শ্রেণিতে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পাঠ দিতে পারবেন।
- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ব্যাকরণের পাঠ্যসূচী অবগত হবেন।
- সমোচ্চারিত, ভিন্নার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ সম্পর্কে জেনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

৬.৩.১. ব্যাকরণ শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

- ভাষাকে শুদ্ধভাবে প্রয়োগ
- বাক্যে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ
- বাক্যের গঠনরীতি ও কৌশলগুলি আয়ত্ত করা
- ভাষার গঠনগত পরিচয় সম্বন্ধে জানা
- সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করে তোলা
- ভাষার অবক্ষয় রোধ করা।

৬.৩.২. ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

- ভাষা ও সাহিত্য বিশ্লেষণে সহায়ক হওয়া ও আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- ব্যাকরণ যে যেকোনো জীবন্ত ভাষার সঙ্গে সমতালে চলে তা বুঝতে শেখা।
- বিভিন্ন স্থান ও কালে রচিত ভাষা ও সাহিত্য বিশ্লেষণে সাহায্য করা।
- বাক্যের গঠনগত ও অর্থগত প্রয়োগে বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে সমতা বিধান করা।
- ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষার অবক্ষয় রোধ করা।
- বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারা।
- ভাষার বিশেষ রীতি ও কৌশলগুলি ব্যাকরণ শিক্ষার দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভব।
- ব্যাকরণ শিক্ষা শুধু ভাষার ব্যবহার, যুক্তি ও বিচারশক্তিকে বিকশিত করে না, সঙ্গে সঙ্গে তা সমাজ মনস্তত্ত্বকেও বুঝতে সাহায্য করে, সে সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

৬.৩.৩. ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব ঃ

উপরে আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ভাষার বিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাকরণ যদি আমরা যথাযথভাবে জানি তবে ভাষা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ সহজ হয়। ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সেখানেই।

- যদিও মাতৃভাষা আমরা শুনে শিখি তবু সেই ভাষার বিজ্ঞান জানা থাকলে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ আরো সহজ হয়।
- ব্যাকরণ শিক্ষা যুক্তির বিকাশে সাহায্য করে। ব্যাকরণ জ্ঞান কোনো ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানগুলির যুক্তিপূর্ণ বিন্যাস ও সমন্বয়কে বুঝতে সাহায্য করে।
- আমরা অনেক সময় ভুল অর্থে শব্দের ব্যবহার করি। ব্যাকরণ জ্ঞান এই শব্দের অপপ্রয়োগের হাত থেকে বাঁচায়। যেমন ‘সুষ্ঠু’ শব্দটি আমরা অনেক সময়ই ‘সুষ্ঠ’ বলে থাকি। তেমনই লক্ষ্যনীয় নয়, লক্ষনীয় (লক্ষ্ + অনীয়)
- ব্যাকরণ জ্ঞান ভাষা ব্যবহারকারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।
- মাতৃভাষার ব্যাকরণ আয়ত্তে থাকলে অন্য ভাষা শিক্ষার সময় তা শুধু সাহায্যই করে না সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণেও আগ্রহী করে তোলে। যেমন— বাংলা ভাষা লিঙ্গ নির্ধারিত ভাষা নয়। লিঙ্গ পরিবর্তনে বাংলার ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, বিশেষণ ইত্যাদির পরিবর্তন হয় না। কিন্তু হিন্দী, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় লিঙ্গান্তরে বিভিন্ন পদের পরিবর্তন ঘটে।
- ব্যাকরণ চর্চা শিক্ষার্থীকে ভাষা ব্যবহারকারীর মনস্তত্ত্ব বুঝতে এবং তাদের প্রতি সহমর্মী হতে ও সহিতত্ব ঘটাতে সাহায্য করে।

সমাজের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরে অবস্থিত মানুষের ভাষার পার্থক্য থাকে। দিন মজুরের ভাষা আর ইঞ্জিনিয়ারের ভাষা এক নয়। দিনমজুর বা নিরক্ষর ব্যক্তি school শব্দের উচ্চারণ ইস্কুল করলে তাকে অনেকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ যে নিয়েছে সে লক্ষ করবে বাংলা ‘দল’ (syllable)-এর গঠন অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উচ্চারণ যথার্থ; বাংলা উচ্চারণ (ইস্-কুল)। বাংলা ভাষায় তিনটি ব্যঞ্জন এবং একটি স্বরধ্বনি (ccuc) নিয়ে কোন ‘দল’ গঠিত হয় না। ফলত আদি স্বরাগমের মাধ্যমে school এই একদল বিশিষ্ট শব্দটি তিনি ভেঙে দুই দল বিশিষ্ট শব্দে পরিণত করেছেন। দুঃখের বিষয় ভারতীয় কোনো শব্দ একইভাবে ইংরেজিতে ভুল উচ্চারিত হলেও আমরা ইংরেজদের ব্যবহৃত উচ্চারণটি সহজেই গ্রহণ করি। যা প্রমাণ করে আমাদের আন্তঃ ঔপনিবেশিক মানসিকতাকেই।

- ছেদ যতি চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার ভাষাকে অর্থবহ করে।
- সন্ধি ও সমাসের জ্ঞান থাকলে নতুন শব্দ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
- বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ ভাষাকে সমৃদ্ধ করে।

৬.৩.৪. পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ব্যাকরণ শিক্ষার সুবিধা ঃ

শ্রেণিতে পাঠদানের সময় কবিতা, গল্প ইত্যাদি পড়াতে পড়াতেই শিক্ষক ব্যাকরণের বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন। বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকে হাতে কলমে অংশে ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় সহজে কীভাবে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ছবিসহ উদাহরণ আছে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ের কার্যকরণের সূত্র সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারবে। শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ, শব্দের অর্থ ও বিপরীতার্থক শব্দ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হবে। পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর শ্রেণিতে স্বরযন্ত্রের গঠন, স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, সন্ধি, যতিচিহ্ন বাক্য ও তার গঠন, প্রতিশব্দ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারবে।

চতুর্থ শ্রেণির ‘ভাষাপাঠ’ নামক সহায়ক পুস্তিকাটি বাগযন্ত্র, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান, সন্ধির সূত্রগুলির ভাষাবিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ, বাক্যের গঠন, যতিচিহ্ন, প্রতিশব্দ ইত্যাদির ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য অত্যন্ত সহজ ও গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শুধু শিক্ষার্থীই নয় শিক্ষক শিক্ষিকারাও এই পুস্তিকাটি নিজেদের ভাষাবিজ্ঞানের ধারণাকে আরো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করতে ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যাকরণের আপাত কাঠিন্য ও ব্যাকরণ চর্চার অনীহা দূর করতে এই ধরনের পাঠ্যপুস্তক বিশেষ সহায়ক।

এভাবেই পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ব্যাকরণ পাঠে বিভিন্ন সংজ্ঞা সূত্র, নিয়ম, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা উৎসাহী ও কৌতুহলী হয়ে উঠবে। ফলত তারা ব্যাকরণের নিয়মাবলী অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণভাবে পড়বে এবং বুঝবে। শিক্ষার্থীরা ভাষা ব্যবহার ও বিশ্লেষণে অনেক বেশি সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে। শুদ্ধ ভাষা ব্যবহারে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তারা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

৬.৩.৫. পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ব্যাকরণ শিক্ষার অসুবিধা ঃ

- ব্যাকরণ বিষয়ে আমাদের অনেকেরই একটি অনীহা দেখা যায়। শিক্ষকের এই অনীহাই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়।
- এই অনীহাও তৈরি হয় শিক্ষকের নিজের ব্যাকরণ জ্ঞানের খামতি থেকে। ফলত তিনি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নিজের জীবনে বা ছাত্রছাত্রীদের জীবনে ব্যাকরণের স্থান কোথায় তা বুঝতে পারেন না।
- পাঠ্যপুস্তকের গতানুগতিক যান্ত্রিকতার বাইরে বেরিয়ে ব্যাকরণ শিক্ষাকে অনেক শিক্ষক শিক্ষিকাই আনন্দপূর্ণ করে তুলতে পারেন না। কেননা তাদের মনে অনেক সময় এই ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে ব্যাকরণ শুধু পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়ার উৎকৃষ্ট উপায়। ফলত পাঠ্যপুস্তকের ব্যাকরণ পাঠ যুক্তিহীন, সমাজ ও পরিবেশ নিরপেক্ষ হয়ে ওঠে।
- অনেক সময়ই শ্রেণিতে পাঠদানকালে কোনোরকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত ব্যাকরণ আলোচিত হলে শিক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে পারে না।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিকে পাঠ্যপুস্তকের ব্যাকরণকে ধারাবাহিকভাবে চর্চা করাবেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ের সঙ্গে ব্যাকরণের বিষয়ের সামঞ্জস্য করা শিক্ষকের ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যায়।
- শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার অভাব থাকলে এ সমস্যাটি আরো জটিল হয়ে ওঠে।
- যেখানে ব্যাকরণের নির্দিষ্ট পাঠক্রম নেই সেখানে শ্রেণিভেদে শিক্ষক ব্যাকরণের কোন্ অংশটি কতটা পরিমাণ পড়াবেন তা নির্ধারণ করতে না পারলে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি জটিল ও যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। ফলত ব্যাকরণ শিক্ষা যেমন অসম্পূর্ণ থেকে যায় তেমনই আনন্দহীন হয়ে পড়ে।
- পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত ব্যাকরণ অনেক সময়ই মুখস্থ নির্ভর হয়ে ওঠে।

অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

১. পঞ্চম শ্রেণিতে সন্ধির কোন অংশটুকু আপনি পড়াবেন?

____

____

২. ব্যাকরণ শিক্ষার মূল লক্ষ্যগুলি কী কী ?

____

____

৩. ব্যাকরণ শিক্ষার অন্তত তিনটি গুরুত্ব সম্পর্কে লিখুন।

৪. সন্ধি ও সমাসের জ্ঞান শিক্ষার্থীদের জীবনে কী কাজে লাগবে বলে আপনি মনে করেন?

৫. পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায় পড়াবার সময় ব্যাকরণের কোনো প্রসঙ্গ এলে আপনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার পূর্বে কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন?

৬.৪. ব্যাকরণ শিক্ষাদানের বিবিধ পদ্ধতি ঃ

ব্যাকরণ শিক্ষা অবশ্যই শিশুর ভাষাজ্ঞান হওয়ার পর শুরু হবে। শিশুর নির্দিষ্ট মানসিক পরিণতি যখন বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করে এবং তার ভাষাজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি বেশ কিছুটা পরিণত হয় তখনই ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু করা প্রয়োজন।

বর্তমানে প্রচলিত ও বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণের নির্ধারিত কয়েকটি নীতি ও পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হল।

আরোহী পদ্ধতি ঃ

আরোহী পদ্ধতি (Inductive method) বা উদাহরণ বিশ্লেষণ পদ্ধতিই বর্তমানে ব্যাকরণ শিক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায় বলে মনে করা হয়। Inductive logic বা আরোহমূলক তর্কবিজ্ঞানের মূলনীতিকে ভিত্তি করেই এই পদ্ধতির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে অনেকগুলি উদাহরণকে প্রথমে বিশ্লেষণ করে কোনো একটি নির্দিষ্ট সূত্রে আমরা পৌঁছাই। যেমন

উদ্ভিদ মরণশীল

গরু মরণশীল

যদুবাবু মরণশীল

অতএব এরা সকলেই যখন জীব। তখন এই সূত্রে আমরা আসতে পারি যে জীব মাত্রেই মরণশীল।

ব্যাকরণ শিক্ষায় এ পদ্ধতি আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি? ধরাযাক কয়েকটি একই রকম স্বরধ্বনির উদাহরণ নেওয়া হল। যেমন

পদ + অর্পণ = পদার্পণ (অ + অ) $\Rightarrow$ আ

হিম + আলয় = হিমালয় (অ + আ) $\Rightarrow$ আ

যথা + অর্থ = যথার্থ (আ + অ) $\Rightarrow$ আ

মহা + আকাশ = মহাকাশ (আ + আ) $\Rightarrow$ আ

এই উদাহরণগুলি থেকে আমরা একটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্রে উপনীত হতে পারি যে ‘অ’ কার কিংবা ‘আ’ কার-এর পর ‘অ’-কার কিংবা ‘আ’ কার থাকলে দুয়ে মিলে ‘আ’ কার হয় এবং ঐ ‘আ’ কার আগের বর্ণে যুক্ত হয়। এভাবেই একাধিক উদাহরণ বিশ্লেষণ করে আমরা কোনো একটি সূত্রে আরোহণ করি বলে একে আরোহী পদ্ধতি বলে। আবার প্রচুর উদাহরণ বিশ্লেষণ করে শেষে কোনো সূত্র সিদ্ধান্তে যাওয়া হয় বলে একে কেউ কেউ উদাহরণ বিশ্লেষণ পদ্ধতিও বলেন।

অবরোহী পদ্ধতি ঃ

এটি আরোহী পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি। এখানে অবরোহমূলক তর্কবিজ্ঞানের Doductive Logic-মূল নীতিকে কাজে লাগানো হয়েছে। যেখানে কোনো একটি সূত্র বা সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণে পৌঁছানো হয়।

যেমন —

যদি সূত্র হয় — সকল জীবই মরণশীল।

ছাগল একটি জীব। অতএব ছাগল মরণশীল।

এভাবেই ব্যাকরণের নির্দিষ্ট কোনো সূত্রকে উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখাতে পারি। যেমন —

সূত্র : অ + ই = এ, অ + ঈ = এ, আ + ই = এ, আ + ঈ = এ অর্থাৎ ‘অ’ কার কিংবা ‘আ’ কার এর পরে ‘ই’ কার কিংবা ‘ঈ’ কার থাকলে উভয় মিলে ‘এ’ কার হয় এবং এই ‘এ’ কার পূর্ববর্তী ধ্বনিতে / বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন —

নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র, অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা, মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র, রমা + ঈশ = রমেশ।

বারবার এই ধরনের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করিয়ে সূত্রকে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করা যায়।

সূত্র পদ্ধতি ঃ

ব্যাকরণ শিক্ষাদানে সিদ্ধান্ত বা সূত্র পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে সাধারণত সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলিকে মুখস্থ করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময়ই ব্যাকরণের জটিল সূত্রগুলি না বুঝেই মুখস্থ করে। মুখস্থ বিদ্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তা ব্যাকরণ পাঠকে নীরস করে। অনেক সময়ই সূত্রের সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো হয় না। এই পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক ও ত্রুটিপূর্ণ হলেও বহু বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়।

তবে মনে রাখতে হবে কোনো পদ্ধতিই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। ব্যাকরণ পাঠদানকালে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। আরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণের সূত্রে উপনীত করে অবরোহী পদ্ধতিতে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা তৈরি করলে ভালো হয়। সূত্র পদ্ধতিতেও বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের প্রচুর প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে।

৬.৫. প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী (কার্যগত) বাগধারা, বাক্যসমূহ এবং বাক্যের শ্রেণি বিভাগ ইত্যাদি

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে শিশুর ভাষাজ্ঞান এবং বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ না হলে ব্যাকরণ শেখানো কার্যকর হয় না। সেইজন্য মোটামুটি তৃতীয় শ্রেণি থেকেই ব্যাকরণের পাঠ সামান্য হলেও আলোচিত হয়েছে। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণিতে হয়নি। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ব্যাকরণের বিষয়গুলি উল্লিখিত হল।

তৃতীয় শ্রেণি ঃ

‘পাতাবাহার’ বই-এর হাতে কলমে অংশে —

১. বর্ণ বিশ্লেষণ ২. সমার্থক শব্দ লেখা ৩. বিপরীত শব্দ লেখা ৪. শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য ৫. একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা ৬. বাক্যরচনা ইত্যাদি।

এর সঙ্গে বই-এর শেষে ‘ভাষাপাঠ’ অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(i) ভাষার কথা

(ii) বাক্যের কথা

(iii) বর্ণ আর ধ্বনির কথা

(iv) নিয়মের কথা

এই অংশে গল্পের ছলে ভাষার স্বরূপ, বাক্যের ধারণা, বর্ণ ও ধ্বনির পার্থক্য ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণি ঃ

১. স্বরসন্ধি ঃ এখানে শুধু সন্ধিবদ্ধ পদটি লিখতে বলা হয়েছে। সন্ধি বিচ্ছেদ করতে বলা হয়নি।

২. বিশেষণ পদগুলির বিশেষ্যরূপ এবং বিশেষ্যপদের বিশেষণ রূপ লেখা

৩. বিপরীত শব্দের প্রয়োগ

৪. প্রতিশব্দ

৫. ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান

৬. বর্ণ বিশ্লেষণ

৭. ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরিচিতি

৮. বাক্যে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদের ধারণা ও শনাক্তকরণ

৯. অল্পপ্রাণ বর্ণ, মহাপ্রাণ বর্ণ, অঘোষ ও সঘোষ বর্ণের ধারণা

১০. লিঙ্গ পরিবর্তন

১১. বচনের ধারণা

১২. নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন পুরুষ বা পক্ষে পরিবর্তন

এছাড়া ব্যাকরণ পাঠে সহায়ক পুস্তিকা হিসাবে ‘ভাষাপাঠ’ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু শিক্ষার্থীরা নয় শিক্ষক শিক্ষিকারও এখানে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে উপকৃত হবেন। ভাষাপাঠে ব্যাকরণের বিষয়গুলি শিক্ষক যেভাবে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন উদাহরণ, চিত্র ও ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে তা অনুসরণ করলে ব্যাকরণ শিক্ষা আর নীরস মনে হবে না। শ্রেণি ও শিক্ষার্থীর বয়স, গৃহপরিবেশ, বিদ্যালয় পরিবেশ, পূর্বজ্ঞান ইত্যাদির বিচার করে উদাহরণগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণি

১. ব্যঞ্জন সন্ধি

২. শব্দ ও পদ — ক্রিয়া, কর্ম, সকর্মক ক্রিয়া, অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়

৩. লিঙ্গ — পুংলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, উভলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ

৪. বচন — একবচন, বহুবচন

৫. পুরুষ — উত্তম পুরুষ, আমি পক্ষ, মধ্যম পুরুষ, তুমি পক্ষ, প্রথম পুরুষ, সে পক্ষ

৬. চিঠিপত্র

৭. বিপরীত শব্দ

৮. অনুচ্ছেদ রচনা

৯. শিখন পরামর্শ

ষষ্ঠ শ্রেণি

ব্যাকরণ অংশ

১. বিসর্গ সন্ধি

২. শব্দের গঠন — মৌলিক ও যৌগিক শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, পূরণবাচক শব্দ

৩. শব্দরূপ, বিভক্তি, অনুসর্গ ও উপসর্গ

৪. ধাতুরূপ, ধাতুবিভক্তি / ক্রিয়ার বিভক্তি ও ক্রিয়া

৫. শব্দযোগে বাক্য গঠন — উদ্দেশ্য, বিধেয়; সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য; অস্ত্যর্থক, নঞর্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

নির্মিতি অংশ

১. সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

২. পদান্তর

৩. পত্র রচনা

৪. অনুচ্ছেদ রচনা

৫. বোধ পরীক্ষণ

৬. দিনলিপি

সপ্তম শ্রেণি

ব্যাকরণ

১. বাংলা ভাষার শব্দ ঃ খাঁটি দেশী শব্দ, তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ, বিদেশীশব্দ, বাংলা ব্যতীত অন্য ভারতীয় শব্দ, মিশ্র শব্দ।

২. বাংলা বানান ঃ ণত্ব ষত্ব, সন্ধি ও পদান্তর ঘটিত নিয়ম, বাংলা শব্দের উদাহরণ, বিদেশী শব্দের বানান

৩. নানারকম শব্দ ঃ রূঢ় শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ, মৌলিক শব্দ, যৌগিক শব্দ, সাধিত শব্দ, শব্দ দ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ

৪. শব্দ তৈরির কৌশল ঃ মৌলিক ও সাধিত শব্দ, কৃৎ প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়, বাংলা প্রত্যয়, বিদেশী প্রত্যয়

৫. কারক বিভক্তি ও অনুসর্গ ঃ বাক্যে বিভিন্ন পদের পারস্পরিক অন্বয়গত সম্পর্ক

নির্মিতি ঃ

৬. পত্র রচনা

৭. প্রবন্ধ রচনা

৮. এক কথায় প্রকাশ

অষ্টম শ্রেণি

ব্যাকরণ

১. দল ঃ মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল

২. ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও ধারা ঃ স্বরাগম, ব্যঞ্জনাগম, ধ্বনিলোপ, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসংগতি, সমীভবন, ধ্বনি বিপর্যয়

৩. বাক্যের ভাব ও রূপান্তর ঃ অস্ত্যর্থক, নঞর্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক ও অনুজ্ঞাবাচক বাক্য এবং অর্থের ভিত্তিতে বাক্যের রূপান্তর সাধন

৪. বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া

৫. ক্রিয়ার কাল ঃ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ; মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল, ক্রিয়ার ভাব

৬. সমাস ঃ ব্যাসবাক্য, সমস্যমান পদ, সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ, পূর্বপদ, পরপদ; সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য; কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, দ্বিগু, নিত্য, অলোপ, বাক্যাশ্রয়ী সমাস

৭. সাধু ও চলিত রীতি

নির্মিতি ঃ

৮. বাংলা প্রবাদ

৯. এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ

১০. পত্র লিখন

১১. প্রবন্ধ রচনা

৬.৬. ব্যাকরণ শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শিক্ষণের সময় কতগুলি বিষয় শিক্ষক শিক্ষিকা লক্ষ্য রাখবেন

- শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ বোধ ও পূর্বজ্ঞান
- শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত ধারণা গ্রহণ ও প্রয়োগের ক্ষমতা
- পূর্ব শ্রেণিতে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা তা কতটা বুঝতে পেরেছে তার একটি মূল্যায়ন
- বিদ্যালয় পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের গৃহ পরিবেশ এবং আর্থ সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে উদাহরণ নির্বাচন।
- ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবহার
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে কোনো বিষয়ে প্রজেক্ট আলোচনা করানো। যেমন চার বা পাঁচজন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি দল বেঁধে তাদের বাক্য সম্প্রসারণ বিষয়টি হাতে কলমে করানো যায়। প্রতিটি দল বা গ্রুপের জন্য একটি করে ক্রিয়াপদ ও কর্তা বেছে দেওয়া যেতে পারে। আবার সমাস ও সন্ধি পড়াবার সময় কোন দল কতগুলি শব্দ তৈরি করতে পারল তা নিয়ে একটি ছোট খেলা খেলতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন। নাহলে ব্যাকরণের কোন বিষয় বোধগম্য না হলে শিক্ষার্থী মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয় নেবে। সেটি কাঙ্খিত নয়।
- কারক পড়াবার সময় একটি এমন বাক্য তৈরি করুন যেখানে ক্রিয়ার সঙ্গে সমস্ত পদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখাতে পারবেন। এক একজন শিক্ষার্থীকে বাক্যের এক একটি পদ হিসাবে চিহ্নিত করুন এবং ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বোঝান। বাক্য গঠন, বাক্য সম্প্রসারণ বোঝাতেও শিক্ষার্থীদের আলাদা করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে বিষয়টি বোঝাতে পারেন।
- সন্ধি বোঝাবার সময় অতিবশ্যই ধ্বনি দুটির উচ্চারণ স্থল নির্দেশ করুন। শিক্ষার্থী সন্ধির ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মটি বুঝতে পেরেছে কিনা যাচাই করার জন্য সন্ধির ফলে উৎপন্ন নতুন ধ্বনিটির উচ্চারণস্থল চিত্রে নির্দেশ করতে বলুন।
- সম্প্রদান কারক কেন বাংলা ভাষায় নেই তা বাক্যের গঠনগত দিক থেকে নিরূপণ করে বুঝিয়ে দিন যে কর্মকারকের সঙ্গে গঠনগত দিক থেকে তার কোনো পার্থক্য নেই। অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সম্প্রদান কারকের জায়গায় নিমিত্তকারক এসেছে। এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটান।
- ধ্বনি পরিবর্তন পড়াবার সময় অবশ্যই চিত্রের সাহায্য নেবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পদ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য একটি কর্মপত্রে কয়েকটি অনুচ্ছেদ দিয়ে বিভিন্ন পদগুলি চিহ্নিত করতে বলুন। বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করতে বলুন।
- বাংলা ভাষা যে লিঙ্গ নির্ধারিত ভাষা নয় তা অন্য দেশী ও বিদেশী ভাষার উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দিন। যেমন হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি।
- ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধান পড়াবার সময় তার ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা করুন। শুধু নিয়ম মুখস্থ করাবেন না।
- ব্যাকরণের বিষয় পড়াবার সময় ধৈর্য্য ধরুন।

● পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বাগধারা, বাক্যসমূহ এবং বাক্যের শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি ছাড়াও স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ ধ্বনি, শব্দ, পদ, বাক্য, শব্দভান্ডার, প্রত্যয়, কারক, বিভক্তি ও অনুসর্গ, সন্ধি, সমাস, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, পদান্তর, ছেদ ও যতিচিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে একজন শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকবে।

ব্যাকরণের কোনো বিষয়ে নিজের ধারণার অস্বচ্ছতা থাকলে 'ভাষাপাঠ' ও 'ভাষাচর্চা' বইগুলি থেকে সাহায্য নিন। বিশদে জানবার জন্য গ্রন্থাগার থেকে সুকুমার সেন, রামেশ্বর শ, পবিত্র সরকার, পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের বাংলা ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থের সাহায্য নিন।

অগ্রগতির যাচাই করুন ঃ

১. সন্ধি পড়াবার সময় আপনি ব্যাকরণ শিক্ষাদানের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন?

____

____

২. সূত্র পদ্ধতি কী অনুসরণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন? আপনার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দিন।

____

____

____

____

৩. বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলি শিক্ষার্থী চিনতে পারছে কিনা তা আপনি কীভাবে যাচাই করবেন?

____

____

____

৪. ব্যাকরণের বিষয় পড়াতে 'দলবদ্ধভাবে কাজ' বিষয়টিকে আপনি কীভাবে কাজে লাগাবেন?

____

____

____

৫. ব্যাকরণ পড়াবার সময় আপনি উদাহরণগুলি দেবার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখবেন?

____

____

____

____

৬.৭. বাগধারা

কোনো ভাষায় সাধারণভাবে বিশিষ্ট অর্থে বা ব্যাঙ্গার্থে বা একাধিক পদ নিয়ে গঠিত যেসব বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয় তাদের বাগধারা, বাগ বিধি বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ বলে।

বাগধারাকে অনেকে এক ধরনের বাগভঙ্গি বলেছেন। বাগধারা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় যার ফলে বাক্যের ভাব তীক্ষ্মতা ও গভীরতা লাভ করে।

১. অকালের বাদলা — অসময়ে বা অপ্রত্যাশিত ঝামেলা বা বিপদ

২. আক্কেল গুড়ুম — স্তম্ভিত ভাব, হতবুদ্ধি অবস্থা

৩. ইঁদুরের কলে পড়া — লোভ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়া বা আটকে পড়া

৪. উচ্ছন্নে যাওয়া — অধঃপাতে যাওয়া, চরিত্রের অবনতি হওয়া

৫. এঁচড়ে (ইঁচড়ে) পাকা — ডেঁপো, জ্যাঠা, অকালপক্ক, অল্পবয়সেই পেকে গেছে এমন (এঁচড়ে পাকা ছেলে)

৬. এঁটো কাঁটা — খাবার পর যেসব উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে

৭. একাই একশো — একাই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সামলাতে পারে এমন

৮. ওজন বুঝে চলা — মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে চলা

৯. কড়ায় কড়ায় — সূক্ষ্ম হিসাব মতো, নিখুঁত হিসাব বুঝে নেওয়া

১০. করাতের দাঁত — উভয় সংকট

১১. কূপমন্ডূক — কুনো বা সংকীর্ণচেতা লোক

১২. খাতা খোলা — হিসাব পত্র আরম্ভ করা, লেনদেন শুরু করা

১৩. গড্ডলিকা প্রবাহ — ভালোমন্দ বিচার না করে সকলে যা করে তাই অনুসরণ করে এমন লোকের দল

১৪. গলগ্রহ — দায় বা বোঝা

১৫. ঘর আলো করা — ঘরের বা পরিবারের শোভা বা গৌরব বৃদ্ধি করা

১৬. ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া — উপরওলাকে উপেক্ষা করে বা অতিক্রম করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করা

১৭. ঘোল খাওয়া — নাকাল বা জব্দ হওয়া

১৮. চড়ুই পাখির প্রাণ — ক্ষীণজীবী, অত্যন্ত দুর্বল লোক

১৯. চোখে চোখে রাখা — দৃষ্টির আড়ালে যেতে না দেওয়া, সতর্ক দৃষ্টি রাখা

২০. ছড়ি ঘোরানো — অশোভন বা বিরক্তিকরভাবে সর্দারি / মাতব্বরি করা

২১. জড়ভরত — জড়বুদ্ধি বা জড়তাগ্রস্ত লোক

২২. ঝড় তোলা — প্রবল ব্যস্ততা বা গতিসম্পন্ন উদ্যোগ শুরু করা

২৩. টিপ্পুনি কাটা — ছোটো-ছোটো বাঁকা / ঝাঝালো উক্তি / মন্তব্য করা

২৪. ঠিকে কাজ — নির্দিষ্ট মজুরিতে কাজ

২৫. ড্যাং ড্যাং করে — কাউকে কোনো তোয়াক্কা না করে / বিজয়গর্বে

২৬. ঢোঁক গেলা — কথা বলার সময় ইতস্তত করা

২৭. তড়বড় করা — তাড়াহুড়ো করা / অত্যধিক ব্যস্ততার ভাব দেখানো

২৮. থাতামুতো দেওয়া — জোড়াতালি দেওয়া / দায়সারাভাবে করা

২৯. দরকচা — কাঁচাও নয় পাকাও নয় এমন অবস্থা

৩০. ধড়ে প্রাণ আসা — বিপদ থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখে বা উদ্ধার পাওয়ায় স্বস্তিলাভ

৩১. নয়ছয় করা — তছনছ করা / পন্ড করা / অপব্যয় করা

৩২. পটের বিবি — সেজেগুজে বসে থাকে এমন বিলাসী ও নিষ্কর্মা মেয়ে

৩৩. ফাটাকপাল — মন্দভাগ্য

৩৪. বাঘাবাঘা — বিরাট / বড়ো-বড়ো

৩৫. ভাঁড়ে মা ভবানী — ভান্ডার শূন্য / একেবারে দরিদ্র / নিঃস্ব অবস্থা

৩৬. মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা — দুর্বল / বিপন্ন লোকের উপর পীড়ন

৩৭. যত নষ্টের গোড়া — সবরকম অন্যায় বা ক্ষতির আসল কারণ

৩৮. রাঘব বোয়াল — অত্যাচারী এবং অন্যের ধন সম্পদ আত্মসাৎকারী প্রভাবশালী লোক

৩৯. লক্ষ্মীর বর যাত্রী — সুসময়ের বন্ধু / সঙ্গী

৪০. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা — কুকর্ম গোপন করার বৃথা চেষ্টা

৪১. ষাঁড়ের গোবর — অকর্মণ্য / অপদার্থ লোক

৪২. সর্বঘটে কাঁঠালি কলা — সব ব্যাপারেই যে অবাঞ্ছিত / বিরক্তিকরভাবে উপস্থিত থাকে।

৬.৮. প্রবাদ প্রবচন

প্রবাদ হলো প্রকৃষ্ট লোক বাদ। বাংলা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদগুলির মধ্যে প্রাজ্ঞদৃষ্টির অসামান্য প্রকাশ সহজেই লক্ষ করা যায়। প্রবাদগুলি একদিকে সর্বজনীনতা লাভ করেছে, অন্যদিকে তার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে বহুযুগের বাঙালি সংস্কৃতির নানা খুঁটিনাটি। স্থানিক পরিবেশ, লোকাচার, জীবন দৃষ্টি, মূল্যবোধ বা সংস্কার-বিচার প্রবাদগুলির প্রধান ভিত্তি। যুগ বদলালেও এই অভিব্যক্তিগুলির কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

প্রধানত দুটি স্তরে প্রবাদ ক্রিয়াশীল হয়। প্রথমটি অভিধার্থ। দ্বিতীয় স্তরে সেই অভিধার্থকে অতিক্রম করে প্রবাদ কোনো চিরন্তন জীবন সত্যকে প্রতিভাত করে। কয়েকটি প্রবাদের নমুনা নীচে দেওয়া হলো —

১. শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি — সারবস্তুহীন ব্যক্তির আস্ফালন

২. নুন আনতে পান্তা ফুরোয় — দারিদ্র্যের অসহ অবস্থা

৩. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট — অধিক লোকজনের সমাগমে কার্য নষ্ট

৪. যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লগুড় বাজে — যে কাজে যে অভ্যস্ত, তারপক্ষেই সেই কাজ করা সহজ

৫. গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না — অতি ঘনিষ্ঠ জনের গুণের কদর হয় না

৬. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় — প্রতাপশালীদের সংঘর্ষ সাধারণের জীবন ধ্বংস হয়।

৭. কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি — কাজ করিয়ে পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা এবং দুর্নাম করা

৮. দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো — খল ব্যক্তির বন্ধুত্বে থেকে বন্ধুহীন থাকা শ্রেয়

৯. পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে — পতনের পূর্বে মাত্রাধিক সক্রিয়তা

১০. ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন-হাত — সামর্থ্য ছাড়াই বাহ্যিক বাবুয়ানির সমালোচনা

১১. থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় — একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি

১২. আদায় কাঁচকলায় — সম্পূর্ণ বিরোধী

১৩. ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় — পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে আশঙ্কা করা

১৪. কাজের মধ্যে দুই খাই আর শুই — আলস্যময় জীবনচর্চার প্রতি ব্যঙ্গ

১৫. হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যায় — যোগ্যতার সীমা না বুঝে কাজ করার চেষ্টা

১৬. মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভান্ডার — বড়ো কর্মকান্ডের পরিকল্পনা করা

১৭. বাজারে আগুন লাগলে পিরের ঘর মানে না — দুঃসময় কোনো সৎ-অসৎ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করে না

১৮. তাল ঘষলে গন্ধ মিঠা, নেবু ঘষলে হয় তিতা — ক্ষেত্র অনুযায়ী ফললাভ

১৯. এক হাতে তালি বাজে না — দুপক্ষের দোষ থেকেই বিবাদ হয়

৬.৯. বাক্য ঃ যখন কয়েকটি সুবিন্যস্ত পদের দ্বারা মনে কোনো একটি ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তখন ঐ পদ সমষ্টিকে বাক্য বলে। বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে – ১। আসক্তি ২. যোগ্যতা ৩. আকাঙ্ক্ষা। বাক্যের বিভিন্ন অংশকে যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট

করার নাম আসক্তি। পদ সমষ্টির উচ্চারণে যদি ভাব প্রকাশে কোনো অসঙ্গতি না থাকে তবে ঐ পদ সমষ্টির বাক্য গঠনের যোগ্যতা রয়েছে। বাক্যের কিছুটা বলা হবার পরে বাকি অংশ শোনবার জন্য যদি আগ্রহ উৎপন্ন হয় এবং পরবর্তী অংশ যদি শ্রোতার আগ্রহ পূরণ করতে সক্ষম হয়, তবে সেই বাক্যটির আকাঙ্খা আছে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় ঃ প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে — একটি উদ্দেশ্য অন্যটি বিধেয়। বাক্যের কর্তৃকারক মূল উদ্দেশ্য। যদিও এখন কর্তাপক্ষ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ বাদে বাকি অংশ বিধেয়। যাকে এখন ক্রিয়াপক্ষও বলা হয়। যেমন 'বাবা কবিতা লিখছেন' এখানে 'বাবা' উদ্দেশ্য এবং 'কবিতা লিখছেন' বিধেয়।

৬.৯.১. গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ ঃ

সরল বাক্য ঃ যখন কোনো বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তখন তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন 'আয়েষা আইসক্রিম খাচ্ছে'। এখানে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া হল 'খাচ্ছে'। আবার 'আয়েষা গান শুনতে শুনতে চুল আঁচড়াতে গিয়ে হোঁচট খেল'। এখানেও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে অতএব এটিও সরল বাক্য। একটি সরল বাক্যে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া একটিই থাকবে।

যৌগিক বাক্য ঃ একাধিক সরলবাক্য যখন কোনো সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণ বাক্য গঠন করে তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন — রবি কলকাতা যাবে এবং ইডেনে ক্রিকেট খেলা দেখবে।

জটিল বাক্য ঃ যখন একটি প্রধান বাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক খন্ড বাক্য বা বাক্যাংশ যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণ বাক্য গঠন করে তখন তাকে জটিল বাক্য বলে। জটিল বাক্যের একটি অংশ অন্য একটি অংশের উপর নির্ভরশীল হয়। যেমন — 'যদি অজিত আসে তবেই খেলা দেখতে যাব।'

মিশ্র বাক্য ঃ যখন এক বা একাধিক সরল বাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক জটিল বাক্য যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তখন তাকে মিশ্র বাক্য বলে। যেমন — 'আয়ুষী রোজ নাচ শিখতে যায় এবং দিদিমণি যা শেখান, বাড়ি এসে তাই অনুশীলন করে, কিন্তু তাই বলে পড়ায় ফাঁকি দেয় না।'

৬.৯.২. অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ ঃ

নির্দেশক বাক্য ঃ যে বাক্যের দ্বারা সাধারণভাবে কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়, সেই বাক্যটিকে নির্দেশক বা নির্দেশাত্মক বাক্য বলে। যেমন —

রবি ক্রিকেট খেলা শেখে।

অস্তর্থক বা সদর্থক বাক্য ঃ যে নির্দেশক বাক্যে কোনো কিছু স্বীকার করা হয় বা মেনে নেওয়া হয় তাকে সদর্থক বা অস্তর্থক বা ইতিবাচক বা হ্যাঁ-বাচক বাক্য বলে। যেমন —

অঙ্কিতা রোজ সন্ধ্যাবেলা গান গায়।

নঞর্থক বাক্য ঃ যে নির্দেশক বাক্যে কোন কিছু অস্বীকার করা বা আপত্তি করা হয়, তাকে নঞর্থক বা নেতিবাচক বা নাস্তর্থক বাক্য বলে। যেমন —

সে কথা আমার একদম মনে নেই।

প্রশ্নবোধক বাক্য ঃ যে বাক্যের দ্বারা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় বা জানতে চাওয়া হয়, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন —

তুমি সন্ধেবেলা কী খাবে? এই হৈ হট্টগোল কেন?

বিস্ময়সূচক বাক্য ঃ যে বাক্যে আনন্দ, বিস্ময়, ভয়, উৎসাহ, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ পায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন —

আহা! কী অপূর্ব দৃশ্য।

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য ঃ যে বাক্যের দ্বারা কাউকে কোনো কিছু করতে বলা হয় বা নিষেধ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে।

সন্দেহবাচক বাক্য ঃ হয়তো, বুঝি, বোধহয় ইত্যাদির প্রয়োগে বক্তার সন্দেহ বা অনুমান প্রকাশ পেলে বাক্যটিকে সন্দেহ বোধক বাক্য বলে। যেমন —

আজ বুঝি ট্রেন ধরতে পারব না।
বোধহয় বিকেলে বৃষ্টি হবে।

৬.১০. সমোচ্চারিত বা প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ ঃ

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলির উচ্চারণ প্রায় এক বা প্রায় একরকম কিন্তু বানানে ও অর্থে ভিন্ন। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় এই শব্দগুলির ভুল প্রয়োগ করে থাকে। যেমন —

{ অর্ঘ — মূল্য
{ অর্ঘ্য — পূজার উপকরণ

{ অণু — ক্ষুদ্রতম অংশ
{ অনু — পশ্চাৎ

{ অভিরাম — সুন্দর
{ অবিরাম — অনবরত

{ অবিহিত — অনুচিত
{ অভিহিত — কথিত

{ অন্ত — শেষ
{ অন্ত্য — নিকৃষ্ট বা শেষের

{ অবিনীত — উদ্ধত
{ অভিনীত — অভিনয় করা হয়েছে এমন

{ অংশ — ভাগ
{ অংস — কাঁধ

{ অশ্ম — পাথর
{ অশ্ব — ঘোড়া

{ আপণ — বাজার
{ আপন — নিজ

{ আয়াস — শ্রম
{ আয়েশ — আরাম

{ আসা — আগমন
{ আশা — আকাঙ্খা

{ ইতি — অবসান
{ ঈতি — শস্যোৎপাদনের ছয় রকম বাধা বা বিঘ্ন

{ উপাদান — উপকরণ
উপাধান — বালিশ

{ উদ্যত — প্রবৃত্ত
উদ্ধত — অবিনীত

{ উদ্দেশে — খোঁজে, সন্ধানে
উদ্দেশ্যে — জন্যে

{ ওষধি — একবার ফল দিয়ে যে গাছ মরে যায়
ঔষধি — যে গাছ রোগ নিবারণ করে

{ কুল — বংশ, সমূহ
কূল — তট, নদী তীর

{ কুজন — খারাপ লোক
কূজন — পাখির ডাক

{ কটি — কোমর
কোটি — শত লক্ষ

{ গিরিশ — মহাদেব
গিরীশ — হিমালয়

{ গোলক — বর্তুল
গোলোক — বৈকুণ্ঠ

{ চির — বহুকাল
চীর — ছিন্ন বস্ত্র

{ জালা — মাটির বড়ো পাত্র
জ্বালা — প্রদাহ

{ জাল — ফাঁদ
জ্বাল — আগুনের আঁচ

{ টিকা — তিলক বা রোগ প্রতিষেধক
টীকা — ব্যাখ্যা বা টিপ্পনী

{ তথ্য — সংবাদ
তত্ত্ব — সত্য

{ তড়িৎ — বিদ্যুৎ
ত্বরিৎ — সত্বর

{ দার — স্ত্রী
দ্বার — দরজা

{ দেশ — রাজ্য
দ্বেষ — হিংসা

{ দূত — প্রতিনিধি, চর
{ দ্যূত — পাশাখেলা

{ ধনী — বড়লোক
{ ধ্বনি — রব

{ ধূম — ধোঁয়া
{ ধুম — সমারোহ

{ নিশিত — শানিত
{ নিশীথ — মধ্যরাত্রি

{ নীর — জল
{ নীড় — পাখির বাসা

{ নুন — লবন
{ ন্যূন — কম

{ পড়া — পাঠ করা
{ পরা — পরিধান করা

{ প্রকার — রকম
{ প্রাকার — প্রাচীর

{ পরূষ — কর্কশ, কঠোর
{ পুরুষ — নর

{ পরভৃৎ — কাক
{ পরভৃত — কোকিল

{ পরিষদ — সভা
{ পারিষদ — সভাসদ, পার্শ্বচর

{ পানি — জল
{ পাণি — হাত

{ বলি — পূজার উপকরণ, দৈত্য বিশেষ
{ বলী — বলশালী

{ বসন — বস্ত্র
{ ব্যসন — ভোগবিলাস

{ বাণ — তীর
{ বান — বন্যা

{ বিশ — কুড়ি
{ বিষ — গরল

{ বিত্ত — ধন
{ বৃত্ত — গোলাকৃতি

{ বিনা — ব্যতীত
{ বীণা — বাদ্যযন্ত্র বিশেষ

{ বৃন্ত — বোঁটা
{ বৃন্দ — সমূহ

{ ভাষা — মনের ভাব প্রকাশক উক্তি
{ ভাসা — ভেসে থাকা

{ মণ — চল্লিশ সের
{ মন — চিত্ত

{ মুখ — বদন
{ মূক — বোবা

{ মূর্খ — অজ্ঞানী
{ মুখ্য — প্রধান

{ মোড়ক — আচ্ছাদনী
{ মড়ক — মহামায়ী

{ যাম — প্রহর
{ জাম — ফল বিশেষ

{ যতি — বিরতি
{ জ্যোতি — দীপ্তি

{ রচক – রচয়িতা
{ রোচক — উপভোগ্য

{ রিক্ত — শূন্য
{ রিক্‌থ — ঐশ্বর্য

{ রিপু — শত্রু
{ রিফু — ছেঁড়া অংশ মেরামত

{ লক্ষ — সংখ্যা বিশেষ
{ লক্ষ্য — উদ্দেশ্য

{ লক্ষণ — চিহ্ন
{ লক্ষ্মণ — রামানুজ

{ লব্ধ — যা লাভ করা হয়েছে
{ লুব্ধ — আকৃষ্ট

{ শব — মৃতদেহ
{ সব — সকল

{ শর — তীর
{ সর — দুধের সর

{ শূর — বীর
  সুর — দেবতা

{ শঙ্কর — মহাদেব
  সঙ্কর — মিশ্রণ

{ শিকার — মৃগয়া
  স্বীকার — অঙ্গীকার

{ শিকড় — গাছের মূল
  শিকর — জলকণা

{ শ্বশ্রূ — শাশুড়ী
  শ্মশ্রু — দাড়ি

{ শুদ্ধ — পবিত্র বা নির্ভুল
  সুদ্ধ — সমেত

{ শারদা — দুর্গা
  সারদা — সরস্বতী

{ শত — একশো
  স্বতঃ — আপনা থেকে

{ শমন — যম
  সমন — আদালতের পরওয়ানা

{ শঠ — প্রবঞ্চক
  ষট — ছয়

{ শণ — তৃণ জাতীয় গাছ বিশেষ
  সন — বৎসর

{ শম — শান্তি
  সম — তুল্য

{ শীত — শীতকাল (ঋতু বিশেষ)
  সিত — শ্বেত

{ শয্যা — বিছানা
  সজ্জা — বেশভূষা

{ সর্গ — পরিচ্ছেদ
  স্বর্গ — দেবলোক

স্বত্ব — অধিকার
সত্ত্ব — গুণ বিশেষ
সত্য — প্রকৃত

সাক্ষর — অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি
স্বাক্ষর — নামসই

সকল — সমস্ত
শকল — মাছের আঁশ

হর্ম — হাইতোলা
হর্ম্য — অট্টালিকা

৬.১১. বিপরীত শব্দ ঃ কোনো শব্দ থেকে অন্য কোনো একটি শব্দের উল্টো অর্থ বোঝায় তখন ঐ শব্দদ্বয়কে একে অপরের বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

যেমন — প্রকাশ্যে – গোপনে, বড় – ছোট, উষ্ণ – শীতল, শীত – গ্রীষ্ম, জীবন – মরণ, দাতা – গ্রহীতা, তিরস্কার – পুরস্কার, প্রাচীন – অর্বাচীন ইত্যদি।

৬.১২. প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ঃ কোনো শব্দের পরিবর্তে একই অর্থ প্রকাশ করে যে সব শব্দ তাদের প্রথম শব্দের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ বলা হয়। যেমন —

সূর্য — ইন্দু, শশী, মৃগাঙ্ক, বিধু, সোম, সুধাংশু

পৃথিবী — মহী, বিশ্ব, জগৎ, ভুবন, বসুন্ধরা

আকাশ — গগন, দ্যৌ, আশমান, নভ, অম্বর, ব্যোম

জল — অপ, পানি, নীর, পয়, বারি, অম্বু

বাতাস — হাওয়া, পবন, বায়ু, সমীর, মলয়, মরুৎ

আগুন — অগ্নি, অনল, বহ্নি, পাবক, সর্বভূক

দেহ — তনু, অবয়ব, অঙ্গ, কলেবর, শরীর, গাত্র, কায়া, বপু

চোখ — লোচন, অক্ষি, আঁখি, নেত্র, চক্ষু, নয়ন

হাত — হস্ত, কর, পাণি, বাহু, ভুজ

বাবা — পিতা, জনক, আব্বা, জন্মদাতা

মা — মাতা, আম্মা, জননী, গর্ভধারিনী, প্রসবিনী

ছেলে — পুত্র, নন্দন, সূত, তনয়, কুমার, আত্মজ, তনুজ

মেয়ে — কন্যা, নন্দিতা, দুহিতা, তনয়া, কুমারী, আত্মজা, তনুজা

৬.১৩. এককথায় প্রকাশ ঃ একাধিক কথায় প্রকাশিত কোনো ভাবকে প্রয়োজন মতো একটি শব্দে প্রকাশ করাকে এককথায় প্রকাশ, একপদীকরণ, বাক্যসংকোচন বা বাক্সংহতি বলা হয়। ভাষাকে সহজ, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও সুন্দরভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে 'এককথায় প্রকাশ' বিশেষ ভূমিকা নেয়। এক্ষেত্রে অর্থের কোনোরকম পরিবর্তন না করেই বাক্যকে ছোটো কিংবা বড়ো করা যায়। এই চর্চার মধ্য দিয়ে ভাষার শব্দ সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব। সংক্ষিপ্ততা ও ঋজুতা এর প্রধান গুণ। বাক্যের রূপ পরিবর্তনে 'এককথায় প্রকাশ' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নীচে এমনই কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. অণুকে যার দ্বারা দেখা যায় — অণুবীক্ষণ

২. অতিথির আপ্যায়ন — আতিথ্য / আতিথেয়তা

৩. অর্থহীন উক্তি — প্রলাপ
৪. অতি দুর্গম স্থান — গহন
৫. আয়ুর পক্ষে হিতকর — আয়ুষ্য
৬. আসল কথা বলার আগে মুখবন্ধ — ভণিতা
৭. আয় বুঝে ব্যয় করে যে — মিতব্যয়ী
৮. আগমনে যার কোনো তিথি নেই — অতিথি
৯. ইন্দ্রের হস্তী — ঐরাবত
১০. ইতিহাস জানেন যিনি — ঐতিহাসিক
১১. ঈশানকোণের অধিপতি — শিব
১২. উপযুক্ত বয়সে হয়েছে যার — সাবালক
১৩. উভয় পাশে বৃক্ষশ্রেণিযুক্ত পথ — বীথি
১৪. উৎকৃষ্ট কাজ — সুকৃতি
১৫. উপন্যাস রচনা করেন যিনি — ঔপন্যাসিক
১৬. উল্লেখ করা হয় না যা — উহ্য
১৭. ঊর্ধ্ব ও বক্রভাবে যা গমন করে — তরঙ্গ
১৮. ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি — ঋত্বিক
১৯. একই সময়ে বর্তমান — সমসাময়িক
২০. এক পাড়ার লোক — পড়শি
২১. ঐক্যের অভাব — অনৈক্য
২২. ওজন করে যে ব্যক্তি — তৌলিক
২৩. ঔষধের জন্য ব্যবহৃত গাছ-গাছড়া — বক্কাল
২৪. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে যে — যাযাবর
২৫. কোথাও উঁচু কোথাও নীচু — বন্ধুর / উচ্চাবচ
২৬. কোনো কিছুর চারদিকে আবর্তন — পরিক্রমা
২৭. শ্বেতবর্ণের পদ্ম — পুণ্ডরীক
২৮. পরিব্রাজকের জীবন বা বৃত্তি — প্রব্রজ্যা / পরিব্রজ্যা
২৯. বৎসের প্রতি গভীর স্নেহ — বাৎসল্য
৩০. ব্যাকরণ জানেন যিনি — বৈয়াকরণ
৩১. যৌগিক অথচ বিশেষ একটি অর্থে সীমাবদ্ধ শব্দ — যোগারূঢ়
৩২. কুকুরের ডাক — বুক্কন
৩৩. একবার শুনলেই যার মনে থাকে — শ্রুতিমধুর
৩৪. রাত্রিকালীন যুদ্ধ — সৌপ্তিক
৩৫. সর্বজনের কল্যাণে — সর্বজনীন

৩৬. স্থপতির কাজ — স্থাপত্য
৩৭. হৃদয়ের প্রীতিকর — হৃদ্য
৩৮. শিক্ষালাভই যার উদ্দেশ্য — শিক্ষার্থী
৩৯. যার দুটি হাতই সমান দক্ষতায় চলে — সব্যসাচী
৪০. সুধাধবলিত গৃহ — সৌধ
৪১. পুণ্যকর্মের ফলশ্রবণ — ফলশ্রুতি
৪২. পৃষ্ঠ (পশ্চাৎ) থেকে যিনি পোষকতা করেন — পৃষ্ঠপোষক
৪৩. বয়সের তুল্য সখা — বয়স্য
৪৪. নৌ চলাচলের যোগ্য — নব্য
৪৫. কাজ করতে দেরি করে যে — দীর্ঘসূত্রী
৪৬. স্বপ্নে শিশুর হাসিকান্না — দেয়ালা
৪৭. চৈত্র মাসের ফসল — চৈতালি
৪৮. খ তে (আকাশে) চরে যে — খেচর
৪৯. ইন্দ্রজালে পারদর্শী — ঐন্দ্রজালিক
৫০. যা উদিত হচ্ছে — উদীয়মান

৬.১৪. এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ

বাংলা ভাষার একটি মজার বৈশিষ্ট্য আছে, একই শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ সম্ভব। এটি আমাদের ভাষার একটি মৌখিক রীতি। একই শব্দ আলাদা আলাদা বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ ও ভাব প্রকাশ করে। যেমন—

বিশেষ্য ঃ

চোখ

১. প্রথমে লোকটির স্বরূপ বুঝতেই পারিনি, পরে তোমার কথায় আমার **চোখ ফুটলো** (প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা)
২. দিদিভাই আমাকে **চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে** (প্রমাণসহ বোঝানো) দিল যে দোকানের দাড়িপাল্লাটি গোলমেলে।
৩. গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে মাথায় ডাব পড়ে যাওয়ায় **চোখে সর্ষেফুল** দেখলাম (দিশাহারা অবস্থা।)
৪. বাচ্চাকে **চোখে চোখে রেখো** যেন পড়ে না যায়। (সতর্ক দৃষ্টি রাখা)
৫. আগাম খবর না দিয়ে সাতসকালে মামাবাড়ি পৌঁছাতে দিদিমার **চোখ কপালে** উঠলো (অতিমাত্রায় বিস্মিত হওয়া)।
৬. রমেশের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে দেখে প্রতিবেশীদের **চোখ টাটিয়েছে** (হিংসা করা)।
৭. মা মরা ছেলেটি ক্রমশ কাকিমার **চোখের বালি** (অপছন্দের ব্যক্তি) হয়ে উঠেছিল।
৮. জমিদারের নায়েব **চোখ রাঙিয়ে** (শাসন করে) দরিদ্র প্রজাদের জানিয়ে দিল যে দ্বিগুণ কর দিতেই হবে।

মাথা

১. সেনাপতির আদেশ **মাথা পেতে** নিয়ে (শিরোধার্য) সৈন্যদল বীরবিক্রমে শত্রুশিবির জয়ের জন্য এগিয়ে গেল।
২. শ্যামবাবু পাড়ার অনুষ্ঠানে বেশি চাঁদা দিয়ে এমন ভাব করছেন যেন তিনি সবার **মাথা কিনে** নিয়েছেন (প্রভুত্বের ভাব)।
৩. সবার মাঝখানে ছেলের উদ্ধত আচরণ প্রত্যক্ষ করে তাঁর লজ্জায় **মাথা কাটা** (অপমানিত হওয়া) গেল।
৪. দিদিমা ছোটো নাতিকে অতিরিক্ত আশকারা দিয়ে তার **মাথাটি খেয়েছেন** (স্বভাব নষ্ট করা)
৫. রেহান বন্ধুর হাতদুটি জড়িয়ে ধরে বলল ‘আমার **মাথা খা** (দিব্যি দেওয়া) কিন্তু ওদের সঙ্গে ঝগড়া করিস না।’

৬. জিনিসপত্রের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় বড়দার পক্ষে এত বড়ো সংসার চালানো **মাথা ব্যাথার** (দুশ্চিন্তা) কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭. মাত্র দুমাস পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা তাই অন্যান্য বিষয়ে **মাথা ঘামানো** (চিন্তা করা) বন্ধ করো।

৮. প্রবীণ রহিমচাচা **গ্রামের মাথা** (প্রধান ব্যক্তি) বলে তাঁর কথা সবাই মানে।

৯. ছোটোবেলা থেকেই **পড়াশুনায়** পিটারের **মাথা** (বুদ্ধিমত্তা) খুব ভালো বলে সবাই তাকে ভালোবাসে।

১০. **অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে** (প্রবঞ্চনা করে) বেশিদিন নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা যায় না।

১১. বাঁচার রসদ জোগাড় করার জন্য শেরপারা **মাথার ঘাম পায়ে ফেলে** (কঠোর পরিশ্রম করে)।

হাত

১. ভাগ দেবার লোভ দেখিয়ে অমল ভাইকে **হাত করে** (বশে আনা) আচারের শিশি চুরি করেছে।

২. দুঃখী মানুষদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁর **হাত খোলা** (দানশীল) স্বভাবের কথা সবাই জানে।

৩. শরিকি গোলমালের জেরে এই নিয়ে আমাদের পাড়ার জীর্ণ মল্লিকবাড়িটি পাঁচবার **হাত বদল** (মালিকানা পরিবর্তন) হলো।

৪. ডাক্তারবাবুর **হাত যশে** (দক্ষতার জন্য বিখ্যাত) বিধবার একমাত্র সন্তান এ যাত্রা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এল।

৫. কাছারিবাড়ির নতুন কর্মচারীটির **হাতটানের** (চুরির অভ্যাস) কথা কিছুদিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল।

৬. দরিদ্র মানুষগুলিকে সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও আইনের দ্বারা আমার **হাত বাঁধা** (নিরূপায়)

৭. শ্রমিকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ফলে মালিক কারখানা বন্ধ করে তাদের **হাতে মারার বদলে ভাতে মারলো** (প্রহারের পরিবর্তে কৌশলে আর্থিক ক্ষতিসাধন)।

বুক

১. অসুস্থ ছেলেটি **মায়ের বুকে** (অঙ্গ) মাথা পেতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

২. আর্ত, নিপীড়িত মানুষদের দুর্দশা দেখে স্বামীজির **বুক ফেটে** (হৃদয় বিদীর্ণ) যায়।

৩. স্বদেশজননীর **বুকের মাঝে** (অন্তরাত্মা) সন্তানের জন্য রয়েছে স্নেহ, মায়া, মমতা।

৪. কুম্ভবীর একাই **বুক দিয়ে** (প্রাণ দিয়ে) নকল বুঁদিগড় রক্ষা করছে।

৫. ওকে ভয় দেখিও না, ওর **ডাকাতের মতো বুক** (সাহসী)।

৬. **ভারতবর্ষের বুকে** (মাটিতে) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে।

৭. একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের **বুক শোকে পাথর** (স্তব্ধ) হয়ে গেছে।

৮. তোমার জন্য রয়েছে **এক বুক (অপর্যাপ্ত) ভালোবাসা**।

৯. হাতে হাত আর **বুকে বুক** (সম্প্রীতির ভাব) মিলিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবো।

১০. এই বিপদের দিনে বড়োভাই হিসেবে তোমাকেই **বুক বাঁধিতে** (সাহস সঞ্চয়) হবে।

বিশেষণ :

পাকা

১. প্রখর তপন তাপে জনজীবন অতিষ্ঠ হলেও **পাকা** (পক্ক) আম কাঁঠালের স্বাদ জিভে জল এনে দেয়।

২. সাগরদিঘির ধার দিয়ে **পাকা** (কংক্রিট) **রাস্তা** ধরে সোজা হাঁটলেই তোমার চরে পৌঁছাবে।

৩. বয়স অল্প হলেও ছেলেটি সব বিষয়েই **পাকা পাকা** (বয়সোচিত নয় এমন) **কথা** বলে।

৪. রঞ্জনকাকু উইলিয়মকে জড়িয়ে ধরে **পাকা** (চূড়ান্ত) **কথা** দিলেন যে পঁচিশে ডিসেম্বর একসঙ্গে কেক কাটবেন।

কাঁচা

১. **কাঁচা** (তরুণ) **বয়স** হলেই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারছ না।

২. **কাঁচামাল** (স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্য) আমদানি-রপ্তানির জন্য জাতীয় সড়কটি ব্যবহার করা হয়।

৩. **কাঁচা ঘুম** (অসম্পূর্ণ) ভেঙে যাওয়ায় কুম্ভকর্ণ বিরাট চিৎকার করে উঠল।

৪. ধূর্ত মেজবাবুর সঙ্গে বিবাদ বাধানোর মতো **কাঁচা কাজ** (ভুল) কোরো না।

৫. এমন **কাঁচা লেখা** (নিম্নমান) কখনোই সংবাদপত্রে ছাপা হবে না।

৬. **কাঁচা খাতায়** (খসড়া) আগে হিসাবটা তুলে রাখো, পরে পাকা করবে।

বড়ো

১. বাস্তব পরিস্থিতি না বুঝে **বড়ো বড়ো কথা** (স্পর্ধিত উক্তি) সবাই বলে।

২. বাড়িতে আজ **বড়ো কুটুম** (শ্যালক) এসেছে তাই ভালো ভালো রান্না হচ্ছে।

৩. দেখলাম যে দোষ করেছে সেই ছেলেটিই **বড়ো গলায়** (চিৎকার করে) সাফাই গাইছে।

৪. আমাদের গ্রামের কানুবাবু **বড়ো লোক** (ধনী ব্যক্তি) হলেও ভীষণ কৃপণ।

৫. বিদ্যাসাগর, রামমোহন, হাজী মহসিন, মাদার টেরিজার মতো **বড়ো মানুষরাই** (মহাপুরুষ) আমাদের আদর্শ।

৬. হেড আপিসের **বড়োবাবু** (প্রধান ব্যক্তি) মানুষ হিসেবে খুব মিশুকে এবং মজাদার।

৭. সরলার মা চোখের জল মুছে মীজানুর-কে আশীর্বাদ করে বললেন **'বড়ো হও'** (খ্যাতিমান)।

৮. কলেজে গিয়ে ছেলেটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশে **বড়ো মানুষী** (ধনী লোকের আদব-কায়দা) চাল শিখেছে।

৯. এত **বড়ো বাড়িতে** (আকার) জাভেদ আর তার বাব-মা মাত্র এই তিনজন বাস করে।

১০. উনি **বড়ো মুখ** করে (প্রত্যাশা) কথাটা বলেছেন তাই আর উপেক্ষা করতে পারলাম না।

ছোটো

১. অসহায়, দরিদ্র মূর্খ স্বদেশবাসীকে **ছোটো নজরে** (ঘৃণা) দেখো না।

২. গ্রামের **ছোটো (আকার)** কুটিরগুলি গাছের সবুজ পাতার মনোরম ছায়ায় ঢাকা।

৩. **ছোটো (বয়স)** থেকেই নরেন্দ্রনাথ ছিলেন নির্ভীক, সত্যবাদী এবং পরের দুঃখে কাতর।

৪. এত লেখাপড়া শিকেও তুমি যে এমন **ছোটো লোকের** (অভদ্র) মতো আচরণ করবে তা বুঝতে পারিনি।

৬.১৫. সারসংক্ষেপ

- ব্যাকরণ শিক্ষার্থীকে ভাষারীতির সঙ্গে পরিচয় করায় এবং ভাষা বিশ্লেষণে উৎসাহী করে।
- ব্যাকরণ ভাষায় শব্দ, পদ ইত্যাদির যথাযথ ও শুদ্ধ প্রয়োগে সাহায্য করে।
- ব্যাকরণ ভাষার গঠনগত পরিচয় দেয়।
- বিদেশীদের ভাষাশিক্ষার জন্য প্রথমদিকে বাংলা ব্যাকরণ রচিত হলেও পরবর্তীকালে বহু বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখেছেন।
- ব্যাকরণ শিখনে আরোহী পদ্ধতি সিদ্ধান্তে এসে আবার অবরোহী পদ্ধতিতে তার বহুল প্রয়োগ ঘটিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা দিতে হবে।
- সূত্র পদ্ধতি বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহৃত হলেও তা বর্জন করাই শ্রেয়।
- প্রতিটি শ্রেণির স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণ সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকবে।

- ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, সামর্থ্য ও ধারণাশক্তির স্তর অনুযায়ী বিন্যস্ত হবে।
- প্রবাদ, বাগধারা, বাক্যের গঠন, শ্রেণিবিভাগ, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে শিক্ষকদের অগ্রগতি থাকতে হবে।

৬.১৬ অনুশীলনী

১. বাংলা অক্ষর প্রথম কোন ব্যাকরণ বই-এ মুদ্রিত হয়?

২. আরোহী পদ্ধতি কাকে বলে? উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

৩. ব্যাকরণ কাকে বলে?

৪. মাতৃভাষা শিক্ষায় ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

৫. মাতৃভাষায় ব্যাকরণ শিক্ষার মূল চারটি লক্ষ্য উল্লেখ করুন।

৬. গঠনগত দিক দিয়ে বাংলা বাক্যকে ক-টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এবং কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭. পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত ব্যাকরণ পাঠদানের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী?

৮. সূত্র পদ্ধতির অসুবিধাগুলি কী কী?

৯. অর্থঅনুসারে বাক্যের প্রকারভেদগুলি আলোচনা করুন।

১০. শ্রেণিতে ব্যাকরণ পাঠদানের সময় শিক্ষকের কোন কোন বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন?

অধ্যায়

৭

লিখন দক্ষতার বিবিধ ক্ষেত্র

৭.১. সূচনা

মানুষ কথা বলতে আগে শিখলেও লিখতে শিখেছে অনেক পরে। অন্যের অনুপস্থিতিতে তাকে কোন বিষয় সম্পর্কে জানাতে মানুষ ছবির সাহায্য নিত। প্রাচীন গুহাচিত্রগুলিতে তার অনেক প্রমাণ আজও আমরা পাই। আরও পরবর্তীকালে মানুষ চিত্রলিপির দ্বারা মনেরভাব প্রকাশ করত। মিশরের হায়ারোগ্লিফিক্স তার উদাহরণ। এরপর এই ছবিগুলির ভাবকে আরও সংহত ও সংক্ষিপ্ত করে আনা হল, জন্ম হল লিপির। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আরেকটি যুগান্তর ঘটল। মানুষ তার মনের ভাবকে কাদামাটির ফলক, চামড়া, প্যাপিরাস পাতা অথবা পরবর্তীকালে কাগজে চিরদিনের জন্য স্থায়ী করতে পারল। আজ আমরা আরো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম্পিউটার, স্মার্টফোনে লিখছি।

৭.২. উদ্দেশ্য

- অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী লিখনের প্রয়োজনীয়তা ও স্বরূপ বুঝতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনে পারঙ্গম হবেন।
- শিক্ষার্থী লিখনের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে অবগত হবেন।

৭.৩. লিখনের উদ্দেশ্য

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এই লিখন দক্ষতা আয়ত্ত করেছে। দীর্ঘ বক্তব্যকে প্রবন্ধাকারে, দূরের বন্ধুকে পত্রাকারে, বিশেষ অনুভূতিকে সৃষ্টিশীল রচনায়, প্রতিষ্ঠানে বা সরকারের নির্দেশ বা অনুরোধকে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করতে শিখেছে। ফলত লিখন দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন যে কোনো সামাজিক জীবের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্কুল কলেজ, আপিসের আবেদনপত্র থেকে ব্যক্তিগত পত্র সর্বত্র লিখনে পারদর্শী না হলে নিজের মনের ভাব অন্যকে বোঝানো সম্ভব হয় না। পাঠকের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি না হলে লিখনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। লিখনের মধ্য দিয়ে কোনো মানুষের ব্যক্তি চরিত্রের নিজস্বতা প্রকাশিত হয়, তার লিপি বিন্যাস দেখে তার মানসিক অবস্থারও হদিশ পাওয়া যায়।

সব লেখারই এক বা একাধিক পাঠক থাকে। এমনকি কেউ যদি নিজের জন্য লেখে সেখানেও স্বয়ং সেই ব্যাক্তিই ঐ লেখার পাঠক। একইভাবে প্রত্যেকটি লেখার একটি উদ্দেশ্যও থাকে - তা বাজার থেকে চাল কেনার কথা মনে করানো হলেও। লিখন দক্ষতা এই দুই-এর মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে।

৭.৪. লিখন দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন

প্রাথমিক ভাবে যে বিষয়গুলির দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন-

লিখন দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুক্তবর্ণের গঠনগত আকৃতি ও উচ্চারণ জানা প্রয়োজনীয়। বাংলা সংখ্যা ও ইংরেজি সংখ্যা গুলিয়ে ফেললে চলবে না। হরফগুলি স্পষ্ট হবে। মাত্রাযুক্ত ও মাত্রহীন বর্ণের পার্থক্য জানতে হবে। লেখায় গুরুচণ্ডালী দোষ যাতে না ঘটে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। লেখায় বানান ভুল থাকলে পাঠকের পাঠ-পীড়া হয়। তাই বানান শুদ্ধ রাখার ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে। এক বিষয় নিয়ে শুরু করে একই অনুচ্ছেদে অন্য বিষয়ের অবতারণা করা হবে না। দ্রুত লেখার অভ্যাস রপ্ত করতে হবে। কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হচ্ছে সে বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরী। বন্ধুকে লেখা চিঠির ভাষা আর প্রধান শিক্ষককে লেখা ছুটির আবেদনের ভাষা এক হবে না। লেখার সময় ছেদ, যতি চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যতিচিহ্নের ব্যবহার জানতে হবে। প্রচলিত বানান রীতির যে কোনো একটি শিক্ষার্থী অনুসরণ করবে। একই লেখায় বিভিন্ন বানান রীতি ব্যবহার করলে অর্থান্তরও ঘটতে পারে। বাক্যে প্রয়োজন বোধে প্রবাদ প্রবচন, বাগ্‌ধারার ব্যবহার করলে ভালো হয়।

শ্রেণিতে লিখন দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের উপায়

পাঠক ও লেখকের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একটি প্রধান উপায় হল লিখন। যেহেতু যার উদ্দেশ্যে লেখা হচ্ছে অর্থাৎ পাঠক এবং কী লেখা হবে তা লেখকের জানা, সেহেতু তার ভিত্তিতে চিন্তাকে সংগঠিত এবং ভাষা নির্বাচন করতে হবে।

• এক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।

• শিক্ষার্থীকে আগে থেকেই কোনো মডেল না দিয়ে তাদের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করবার সুযোগ দেবেন।

• কোনো বিষয়ে লিখতে দেবার আগে সেই বিষয়ের কোনো ছবি তাদের সামনে রাখতে পারেন। আজকাল বেশির ভাগ মানুষের কাছেই স্মার্টফোন থাকে। প্রয়োজনে বিষয়টির উপর ছোটো একটি ভিডিও দেখাতে পারেন। বিষয়টি সম্পর্কে নিজে সামান্য আলোচনা শুরু করে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিকভাবে আলোচনা করতে উৎসাহী করুন। আলোচনার ফলাফলগুলি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন। বিভিন্ন খসড়া প্রস্তুত হবার পরে কোন সূত্রগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্দীষ্ট রচনায় অভিপ্রেত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় স্থির করুন। এরপর শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় লিখতে দিন।

• নিম্নশ্রেণিতে পাঠরত শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট ছোট গল্প বা কবিতা রচনায় উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে।

• ছুটির পর স্কুল খুললে, ছুটিতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখে বন্ধুদের সামনে তা পাঠ করতে পারে।

• নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখতে উৎসাহ দিন।

• দিনলিপি লিখতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে পারেন।

• স্কুলে এক বা একাধিক দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করতে বলুন।

• বিদ্যালয়ের পত্রিকায় লেখার জন্য উৎসাহ দিন ও অনুশীলন করান।

• পরিবার ও স্কুলের বন্ধুদের জন্মদিন বা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা পত্র, কার্ড ইত্যাদি লিখতে ও আঁকতে উৎসাহ দিন।

• কোনো লেখক, খেলোয়াড়, অভিনেতা বা রাজনীতিবিদকে তাদের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য চিঠি লিখতে উৎসাহ দিতে পারেন।

• স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জনচেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক পোস্টার তৈরিতে সাহায্যে করুন।

• বাড়ির কোনো বিশেষ রান্নার প্রণালী লিখে রাখতে বলতে পারেন।

• গ্রাম, শহর, পাড়া বা বিদ্যালয়ের আশেপাশের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কোনো উদ্বেগমূলক বিষয় দেখা দিলে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে বা স্থানীয় কাগজে লিখতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

• শিক্ষার্থীদের গ্রাম বা পাড়ার একটি পথ নির্দেশিকা তৈরি করতে বলতে পারেন।

৭.৫. অনুচ্ছেদ রচনা:

বিষয়বস্তুর বাক্যসমূহ চিহ্নিত করণ, বাক্যসমূহের যুক্তিযুক্ত বিন্যাস, সংযোগকারী শব্দ ও বাগ্‌বিধির সাহায্যে বাক্যসমূহের সংযুক্তিকরণ

রচনা লেখার প্রাথমিক পর্যায় হল অনুচ্ছেদ রচনা। কোনো একটি বিশেষ ভাব যখন কতগুলি বাক্য সমষ্টি নিয়ে পরিস্ফুট হয় তখন তাকে অনুচ্ছেদ বলে। প্রাথমিক স্তর থেকেই ছোট ছোট অনুচ্ছেদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। যে বিষয়ের উপরে অনুচ্ছেদ লেখা হবে তার কতগুলি নির্দিষ্ট সংকেত থাকে। শ্রেণিকক্ষে তা কীভাবে প্রকাশ করা যায় তা নীচে আলোচনা করা হল।

ধরা যাক পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণিতে নিম্ন প্রাথমিকে 'একতাই বল'— এই বিষয়ের উপরে অনুচ্ছেদ লিখতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রথমে NCERT প্রযোজিত ও ভীম সেন নির্মিত 'এক, অনেক, একতা' নামক কার্টুনটি দেখালেন। এবার শিক্ষার্থীদের কার্টুনটি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দিন। প্রথমে জুটি বেধে এবং পরবর্তীতে অনেকে মিলে। শিক্ষার্থীরা যে যে চিন্তাসূত্র বা ভাবনা প্রকাশ করবে তা ব্ল্যাকবোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। ভাবনাচিন্তা গুলি স্বাভাবিক ভাবেই ক্রম অনুযায়ী থাকবে না। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন যে চিন্তা বা ভাবগুলিকে কেন ক্রম অনুযায়ী সাজানো প্রয়োজন। এবার ভাবনা গুলি বা চিন্তাসূত্র থেকে ছোটো ছোটো সহজ সরল বাক্য লেখা হবে । এভাবেই শিক্ষক **বিষয়বস্তুর বাক্যসমূহ চিহ্নিত** করবেন। কখনই কোনো রচনার বিষয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের আগে থেকে চিন্তাসূত্র বা সংকেত দিয়ে দেবেন না। তাতে শিক্ষার্থীরা ছোটো বেলা থেকে রচনা লেখায় আত্মবিশ্বাসী হবে না। তারা মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয় নেবে এবং অনুচ্ছেদ রচনার প্রতি উৎসাহ হারাবে।

এরপর শিক্ষককে **বাক্য সমূহের যুক্তিযুক্ত** বিন্যাসটি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। যে চিন্তাসূত্রগুলিকে বাক্য ব্যবহার করা হল তার যুক্তিযুক্ত বিন্যাস প্রয়োজন। ভাবনাটি যেন ক্রমানুসারে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষক বাক্যসমূহ চিহ্নিতকরণ ও বিন্যাসের পরে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে কীভাবে **সংযোগকারী শব্দ ও বাগ্‌বিধির প্রয়োগে** রচনার গুণমান আরও ভালো হয়। মনের ভাব এর ফলে আরও যথাযথভাবে প্রকাশিত হবে।

সরল আটপৌরে বা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে চলিত ভাষায় শিক্ষার্থীদের লিখতে শেখান। বানান ও ছেদ,যতি চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে লক্ষ্য রাখুন। শিক্ষার্থী যাতে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করে সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। শ্রেণির প্রত্যেক লেখাই যেন স্বতন্ত্র হয়। বিষয় অনুযায়ী অনুচ্ছেদের একটি শিরোনাম ব্যবহার করতে শেখান। লেখা হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের লেখাটি পুনরায় পড়ান এবং কোনো অসংগতি তারা খুঁজে পাচ্ছে কিনা তা দেখতে বলুন। দরকার হলে নিজে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন অসংগতিগুলি দূর করতে। শিক্ষার্থীদের শিশু সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত করুন। উচ্চ শ্রেণীতে প্রবন্ধ ও রচনার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন। Formal Essay এবং Informal Essay লেখার ধরণ, ভাষাবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যে আলাদা সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করুন।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একই ভাবে পূর্ববর্তী পদ্ধতি অনুসরণ করান। ধরা যাক 'মিলে সুর মেরা তুমহরা' গানটির ভিডিও আপনি শ্রেণিতে দেখালেন, এবার শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যে চিন্তাসূত্র গুলি তুলে আনবে তা থেকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' অথবা 'জাতীয় সংহতি ' বিষয়টিতে আপনি পৌঁছাতে পারেন। শ্রেণিতে যদি একাধিক বিপরীতধর্মী চিন্তাসূত্র উঠে আসে তখন আপনি ছোটো একটি বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত করতে পারেন। যেহেতু উচ্চ শ্রেণিতে একটি মাত্র অনুচ্ছেদে লিখলে হবে না সেহেতু শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাবনাক্রম কীভাবে এক একটি অনুচ্ছেদে আলাদা করে প্রকাশ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রবন্ধে সূচনা, বিষয় বস্তু ও উপসংহারের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। কখনই রচনা বা প্রবন্ধ লিখিয়ে মুখস্থ করাবেন না। গতানুগতিক পদ্ধতিতে অনেক শিক্ষার্থীই রচনা মুখস্থ করে আসে এবং 'শীতের সকাল' রচনা লিখতে দিলে অনেকেই 'শীতকাল' ঋতু সম্বন্ধে একটি লেখা তৈরি করে। শ্রেণিতে আলোচনার সময় গতানুগতিক চিন্তা থেকে মুক্তির পথ ছাত্রদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই উঠে আসবে। শিক্ষক সেখানে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন। অনেক শিক্ষার্থীই বিষয় বহির্ভূত অংশের অবতারণা করে লেখাকে দীর্ঘ করে। শিক্ষার্থীদের বোঝান যে লেখা অনর্থক দীর্ঘ হলে পাঠক অসন্তুষ্ট হন। রচনার সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

১. লিখন ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষক কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন?

২. অনুচ্ছেদ রচনা করাবার সময় আপনি ক্লাসরুমে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি অনুসরণ করবেন?

৩. অনুচ্ছেদ রচনা বিষয়টিকে আরো আনন্দপূর্ণ করতে আপনি কি কি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহার করতে পারেন?

৭.৬. লিখনের বিভিন্ন রূপ: পত্ররচনা, আবেদন পত্র, অভিযোগ পত্র, নিমন্ত্রণ পত্র, অনুমতি পত্র, বার্তা, নোটিশ, পোস্টার ইত্যাদি।

আজ S.M.S., e-mail-র যুগে যখন সকলের হাতে হাতে স্মার্টফোন ঘুরছে তখন পত্রলিখন বিষয়টি অনেকটাই ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু দূরের মানুষের সঙ্গে একসময় যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল চিঠিপত্র। আজ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটলেও চিঠিপত্রের ব্যবহার সামাজিক, বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। ব্যক্তিগত পত্রের ব্যবহার যদিও কমে এসেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) অহোমরাজকে লিখিত কোচবিহাররাজ নারায়ণের পত্র বাংলা পত্রের আদি নির্দশন।

পত্রের বিভিন্ন প্রকার :

১. ব্যক্তিগত পত্র

২. সামাজিক পত্র

৩. বৈষয়িক বা ব্যবহারিক পত্র

৪. ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক পত্র

৫. আবেদন বা দরখাস্ত জাতীয় পত্র, প্রশাসনিক পত্র

পত্রের ভাষা হবে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল। পত্রের বিষয় অনুসারে মূল বক্তব্য সহজবোধ্য হবে। বিষয় ও পাঠকের কথা মাথায় রেখে শব্দচয়ন করতে হবে। প্রয়োজনে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে একাধিক বিষয় ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। বিভিন্ন প্রকার চিঠির কাঠামোগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। ব্যক্তিগত পত্রে আবেগ উচ্ছ্বাস থাকলেও অন্য প্রকার পত্রে তা বর্জন করতে হবে। নির্ভুল বানানে, যথাযথ যতিচিহ্নের ব্যবহারে সংক্ষেপে চিঠির বিষয়বস্তু লিখতে হবে। বিষয় গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পুনরুক্তিদোষ বর্জন করতে হবে।

চিঠি লেখার নিয়ম কানুন :

- চিঠির উপরের বাম দিকে প্রারম্ভিক সম্বোধণ বা সম্ভাষণ থাকবে।
- চিঠির উপরের ডানদিকে যে চিঠি লিখছে বা প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ দিতে হবে।
- এরপর চিঠির মূল অংশ
- মূল অংশের শেষে সমাপ্তিবাচন বা বিদায় সম্ভাষণ এবং চিঠির লেখকের নাম চিঠির শেষে ও নীচে লিখতে হবে।
- যার কাছে চিঠি পাঠানো হচ্ছে বা চিঠি প্রাপকের ঠিকানা চিঠির শেষে বামদিকে লিখতে হবে।

চিঠির সম্বোধন বা সম্ভাষণের ক্ষেত্রে কতগুলি রীতি মানা হয়, যেমন—

- বন্ধু বা সমবয়স্কদের ক্ষেত্রে- প্রিয়, প্রিয়বন্ধু, ভাই, বন্ধুবর, প্রিয়বরেষু, বন্ধুররেষু, সুহৃদ।
- বয়োজ্যেষ্ঠ বা পূজনীয় আত্মীয়দের ক্ষেত্রে- শ্রীচরণেষু, পরমপূজনীয়/পরমপূজনীয়া, পূজনীয়/পূজনীয়া, শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া, মাননীয়/মাননীয়া ইত্যাদি।
- বয়সে ছোটোদের ক্ষেত্রে- কল্যানীয়/কল্যানীয়া, স্নেহভাজন, প্রীতিভাজন ইত্যাদি।

একই রকমভাবে চিঠির শেষে বিদায় সম্ভাষণেও কিছু রীতি প্রচলিত—

- বন্ধু বা সমবয়স্কদের ক্ষেত্রে- ইতি তোমার বন্ধু, ইতি প্রীতিধন্য ইত্যাদি।
- বয়সে বড়ো গুরুজনদের ক্ষেত্রে- ইতি প্রণত, আশীর্বাদাকাঙ্খী, খাকসার ইত্যাদি।
- বয়সের ছোটোদের ক্ষেত্রে- শুভাকাঙ্খী, শুভার্থী, শুভানুধ্যায়ী প্রভৃতি।

ব্যক্তিগত চিঠির নমুনা ঃ

পত্রের নমুনা-১

প্রিয় মইদুল, নতুন গ্রাম, বীরভূম

১২/০২/২০১৬

আজ হঠাৎ জানলা দিয়ে দইওয়ালাকে যেতে দেখে তোর কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের সরকারি আবাসনের রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত 'ডাকঘর' নাটকের অংশগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। এখন যেখানে আছি তার সামনের মাটির রাস্তাটা এঁকেবেঁকে দূরে এক টিলার দিকে চলে গেছে। পাশে আছে তালগাছের সারি। 'ডাকঘরে'র ছবি না 'নন্দলাল বসু'র আঁকা মাঝে মাঝে ধন্দ লাগে। এখানে কোনো নজরদারির ব্যবস্থা নেই। অথচ কেউ কোনো কাজে ফাঁকি দিচ্ছেনা। মনে হয় যেন ঘড়ির সেকেন্ড আর মিনিটের কাঁটাগুলো ওরা উপড়ে ফেলেছে। সূর্যের সাথে তাল মিলিয়ে সবাই যেন রাজার বাড়ি আসছে যাচ্ছে। নাগরিক শশব্যস্ততার উল্টোদিকে এ যেন ওদের নীরব প্রতিবাদ। ফোন করতেই যাচ্ছিলাম, তারপর মনে হল রাজার চিঠি না হোক বন্ধুর চিঠি পেলে তোর ভালোই লাগবে। ভালো থাকিস। কাকু ও কাকিমাকে আমার প্রণাম জানাস।

মইদুল ইসলাম ইতি–

৫৫ রাজা মনীন্দ্র রোড তোর বন্ধু,

কোলকাতা-৭০০০০২ অভিজিৎ

ব্যবহারিক বা বৈষয়িক পত্রের ক্ষেত্রে প্রাপকের ঠিকানা ও সম্ভাষণের মাঝে চিঠির বিষয়টি উল্লেখ করতে হয়।

পত্রের নমুনা -২

মায়ের অসুস্থতার কারণে স্কুলে অনুপস্থিত থাকার জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে ছুটি মঞ্জুরের আবেদন

মাননীয় প্রধান শিক্ষক
দমদম বিদ্যামন্দির
কোলকাতা-৭০০০৭৪

বিষয়: ছুটি মঞ্জুরের আবেদন

মহাশয়,

আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমি আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির 'গ' বিভাগের ছাত্র। আমার ক্রমিক সংখ্যা ১৩। ১৮ই জুন আমার মায়ের হৃৎপিন্ডের অস্ত্রোপচারের জন্য আমাকে মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালে উপস্থিত থাকতে হবে। ফলত ১৮ই জুন থেকে ২০ জুন আমি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকব।

আমার বিনীত প্রার্থনা, আমাকে ঐ তিনদিনের আগাম ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনত
আপনার অনুগত ছাত্র
সোমনাথ মল্লিক
অষ্টম শ্রেণি, 'গ' বিভাগ
ক্রমিক সংখ্যা- ১৩

১২/০৫/২০১৬
কোলকাতা-৭০০০৫০

পত্রের নমুনা-৩

পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে সুষ্ঠু জলনিকাশি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র ঃ

মাননীয় পৌরপ্রধান,
বরানগর পৌরসভা
বরানগর, উত্তর ২৪ পরগণা

বিষয়: সুষ্ঠু জলনিকাশি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন

মহশয়,

আমরা আপনার পুরসভার অন্তর্গত ২১নং ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। আপনি অবগত আছেন যে প্রতি বছর বর্ষার সময় আমাদের ওয়ার্ড দীর্ঘ দিন জলমগ্ন হয়ে থাকে। জমা জল থেকে একাধিক রোগেরও প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এই সময়। অন্যান্য ওয়ার্ডে জল নিকাশি ব্যবস্থাকে উন্নত করা হলেও আমাদের ওয়ার্ড তা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। রাস্তার পাশের নর্দমাগুলির কার্যত আর কোনো অস্তিত্ব নেই। ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থারও উন্নতি প্রয়োজন।

এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে একান্ত অনুরোধ যে আপনি নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য উদ্যোগী হন। আসন্ন বর্ষায় নিদারুণ দুর্ভোগের হাত থেকে এ-বছর যেন আমরা মুক্তি পাই।

ধন্যবাদান্তে
শুভঙ্কর দাস
২১ নং ওয়ার্ডের অধিবাসীদের পক্ষে
বরানগর, উত্তর ২৪ পরগণা

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

পত্র নমুনা -৪

রাস্তা সংস্কারের আবেদন জানিয়ে অঞ্চল প্রধানকে পত্র ঃ

মাননীয় অঞ্চল প্রধান সমীপেষু
পূর্ব দিনহাটা, ব্লক নং ১
কোচবিহার

মহাশয়,

আমরা দিনহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাদের গ্রামে কয়েকটি রাস্তার সংস্কার হলেও আমাদের বিদ্যালয়ে আসার প্রধান রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। আগের রাস্তাটি যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। বর্তমানে পণ্যবাহী বিশালাকায় গাড়ির চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তাটি স্থানে স্থানে ভেঙে গেছে। কয়েকটি বড়োগর্ত মরণ ফাঁদের মতো হয়ে উঠেছে। প্রায়ই বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা ছোটোখাটো দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। রাস্তাটির বেহাল অবস্থার কারণে আমাদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আপনি অনুগ্রহ করে রাস্তাটির সংস্কারসাধনের ব্যবস্থা করলে বিশেষ উপকৃত হব।

বিনীত
দিনহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ

মধ্যপল্লী, পূর্ব দিনহাটা
২০ জানুয়ারি, ২০১৫

নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি

পাটুলী স্পোর্টিং ক্লাব

পাটুলী, বর্ধমান

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে ক্লাবের মাসিক চাঁদা ৪০ টাকার পরিবর্তে ৫০ টাকা করা হল। যদিও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য এরপর সদস্যদের আর কোনো অর্থ দিতে হবে না। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির কারণে ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছে। এ বিষয়ে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আশা করছি।

প্রভাতচন্দ্র বর্ধন
সম্পাদক
পাটুলী স্পোর্টিং ক্লাব
পাটুলী, বর্ধমান

পোস্টার

পোস্টার লিখনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে তা যেন অতি অল্পকথায় লেখা হয়। গভীর তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তাকে দু এক কথায় প্রকাশ করলে এবং যদি তা ছন্দোবদ্ধ হয় তবে জনমানসে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পোস্টার-এ ছবি বা চিত্র ব্যবহার করলে তা আরো জোরালো হয়।

যেমন–– 'গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান'
'একটি গাছ অনেক প্রাণ'
'ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে চান?
মশারি টাঙিয়ে ঘুমোতে যান।'
'ওজনে যদি দাও কানা
দিতে হবে জরিমানা'

৭.৭. লিখন শৈলী

প্রত্যেক মানুষেরই 'নি-ভাষা' বা নিজস্ব ভাষা থাকে। প্রত্যেকের কথা বলার ধরণ যেমন আলাদা তেমনই প্রত্যেকের লেখার ধরণও আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের হস্তলিপি কৌশল ও ভাষা ব্যবহার কৌশল দুই লিখন শৈলীর অন্তর্গত।

প্রাচীন শ্লোকে পাই–

'সমানি সমশীর্ষানি ঘনানি বিরলানি চ।
অব্যাকুলিত মাত্রানি যো বৈ লিখতি লেখক:॥'

অর্থাৎ প্রতিটি বর্ণ সমান, সমশীর্ষ, ঘন হবে। পাশাপাশি অবস্থিত বর্ণ ও শব্দ নিদিষ্ট দূরত্বে থাকবে। মাত্রা যেমন তেমন হবে না। ভালো হাতের লেখায় স্পষ্টতা, সারল্য, ব্যবধান, সমরূপতা, দ্রুততা, যথাযথ যতিচিহ্নের ব্যবহার, নির্ভুলতা এই গুণগুলি থাকবে।

শিশুদের বর্ণক্রম পদ্ধতি ও ভাষাক্রম পদ্ধতিতে লেখা শেখানো হয়ে থাকে। যদিও নিম্নশ্রেণিতে অনুলিপি (Transcription) -এর সাহায্যও নেওয়া হয়। ঠিক ভঙ্গিতে কলম ধরা, হাত ও আঙুলে যথাযথ সঞ্চালন, বসার ভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শ্রুতি লিখন যদিও বানান শিক্ষায় সহায়তা করে না তবু লেখার গতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের শ্রুতিলিখন অভ্যাস করানো যায়। একটি গদ্যাংশ পাঠ করে তারপর প্রত্যেকটি বাক্য একবার করে ধীরে পাঠ করতে হবে।

হাতের লেখার শৈলী সকলের সমান হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায়ের হাতের লেখার শৈলী সর্বজন বিদিত।

হাতে লেখার মতোই লেখকের ভাষা শৈলীর বিশিষ্টতা দেখা যায়। যেমন– ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহন রায়ের রচনায় ছেদযতির ব্যবহার ছিল না। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় তার সার্থক ব্যবহার করলেন। একসময় গদ্যে বঙ্কিমী রীতির চল ছিল। আবার রবীন্দ্র সমসাময়িককালে বা তার পরবর্তীকালেও অনেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষা শৈলীর ব্যবহার করেছেন। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্র' পত্রিকার মাধ্যমে চলিত বাংলাকে বাঙালির লিখনশৈলীতে স্থান দিলেন।

৭.৮. নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত লিখন

লেখা বিষয়টি কষ্টসাধ্য বলে অনেক শিক্ষার্থীই লিখতে চায়না। ফলে তাদের হস্তলিপি ও ভাষা কৌশল দুই বিকশিত হতে বাধা পায়। তাই বিভিন্ন কৌশলে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত লিখনের অভ্যাস করাতে পারেন। তবে অনেক সময়ই শিক্ষার্থীরা অনুচ্ছেদ, পত্র ইত্যাদি রচনার সময় তারা কাঠামোগত দিক সম্পর্কে সচেতন থাকে না। শিক্ষক এই নিয়মগুলি যেমন শিক্ষার্থীদের জানাবেন তেমনই লেখা অতিরিক্ত দীর্ঘ বা অত্যন্ত ছোট হয়ে যাচ্ছে কিনা সে সম্পর্কেও খেয়াল রাখবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শব্দের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন শ্রেণি অনুযায়ী।

৭.৯. অবাধ ও সৃষ্টিশীল লিখন

শুধু নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত লিখন নয় বিদ্যালয় শিক্ষায় অবাধ ও সৃষ্টিশীল লিখন অত্যন্ত জরুরী। যেখানে শিক্ষার্থী অনেক বেশি স্বাধীন তার ভাবাবেগ প্রকাশে। শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা প্রকাশ ও বৃদ্ধিতে এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কবিতা, গল্প, ইত্যাদি রচনায় উদ্বুদ্ধ করবেন। ছোট ক্লাসে একটি গল্প সূত্র দিয়ে এক একটি দলকে আলাদা আলাদা গল্প বলতে বলবেন। সংকেতগুলি বোর্ডে লিখবেন এরপর ঐ সংকেতগুলি দিয়ে নতুন একটি গল্প লিখতে বলবেন। বেড়িয়ে আসার পর নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখে দেখাতে বলবেন। উৎসাহ দেবার জন্য শিক্ষার্থীর লেখাটি ক্লাসে পাঠ করে শোনাবেন। দেওয়াল পত্রিকা, স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য কবিতা, গল্প, রচনা লিখতে উৎসাহ দেবেন। কারোর মধ্যে বিশেষ প্রতিভার স্ফূরণ দেখলে স্থানীয় লিটল ম্যাগাজিন বা শিশু কিশোর পত্রিকায় কীভাবে তা পাঠাতে হবে তার হদিস দেবেন। শিক্ষার্থী যা লিখতে চাইছে তাই প্রকাশ করতে পারছে কিনা তা লক্ষ্য রাখবেন। লেখার নামকরণ যেন মূল বিষয়টির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়।

৭.১০ সারসংক্ষেপ

লিপির আবিষ্কার মানব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

লিখন দক্ষতার উৎকর্ষসাধন আত্মপ্রকাশ ও সামাজিক যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

সব লেখারই এক বা একাধিক পাঠক থাকে।

পাঠক ও লেখকের মধ্যে সেতুবন্ধন লিখনের দ্বারা হয়।

অনুচ্ছেদ রচনায় বিষয়বস্তুর বাক্যসমূহ চিহ্নিতকরণ, বাক্য সমূহের যুক্তিযুক্ত বিন্যাস, সংযোগকারী শব্দ ও বাগ্‌বিধির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

লিখনের বিভিন্ন রূপ ঃ অনুচ্ছেদ, পত্র, বার্তা, নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার ইত্যাদি।

পত্রের বিভিন্ন প্রকার- ব্যক্তিগত পত্র, সামাজিক পত্র, বৈষয়িক বা ব্যবহারিক পত্র, বাণিজ্যিক পত্র, আবেদন, দরখাস্ত বা প্রশাসনিক পত্র।

লিখন শৈলীর উৎকর্ষ সাধনে হস্তলিপি ও ভাষা শৈলী দুই-এরই অভ্যাস জরুরী।

নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত লিখনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অবাধ ও সৃষ্টিশীল রচনায় উৎসাহিত করা উচিত।

৭.১১ অনুশীলনী

১. ভালো হাতের লেখার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

২. সাধারণত চিঠিপত্র কয় রকমের হয় এবং কি কি?

৩. চিঠি লেখার নিয়মকানুনগুলি লিখুন।

৪. হাতের লেখা অনুশীলনে আপনি প্রাথমিক স্তরে কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করবেন?

৫. লিখন শৈলী বলতে কী বোঝেন?

৬. কোন ধরনের লিখনে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল লিখন ক্ষমতা প্রকাশ পায়?

৭. অনুচ্ছেদ রচনার সময় কোন বিষয়গুলি অনুসরণ করতে হয় লিখুন।

৮. শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের উপায়গুলি কি কি?

অধ্যায়

৮

প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষা শিখন—শিক্ষণের বিভিন্ন প্রেক্ষিত

বিষয়বস্তু :

- বহু ভাষাভাষী ও বিবিধ সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বাংলা শিক্ষণ
- প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলা শিক্ষণ, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা শিক্ষণে বিকাশমূলক আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ; প্রথম ভাষা আত্মস্থকরণের মূল উপকরণসমূহ
- বাংলা ভাষা শিক্ষণ সূচনায় উপযুক্ত বয়ঃক্রমজনিত প্রেক্ষিত বিবেচনা।

৮.১ সূচনা

ভারতের অন্তর্গত রাজ্যসমূহে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, জাতির, ভাষার মানুষ বসবাস করে। একত্রে সহাবস্থানের ফলে এদেশের সংস্কৃতি আজ মিশ্র সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, খাদ্যাভ্যাসে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে সর্বত্রই মিশ্রসংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন কতকগুলি স্পর্শকাতর বিষয় রয়েছে যেখানে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হয়, ভাবা দরকার। এমনই একটি বিষয় হল ভাষা। আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমাদেরই রাজ্যে, শহর ও শহরতলী এলাকায় পাশাপাশি বাস করেন বহু রাজ্যের মানুষ। যাদের ভাষা ভিন্ন কিন্তু এখানেই তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। জন্মসূত্রে, কর্মসূত্রে এবং বিশ্বায়নের কারণে ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়কে আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে কোনো না কোনো উপায় আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। একই রাজ্যে যখন একই ভাষা কখনও প্রথম ভাষা কখনও দ্বিতীয় ভাষা তখন ভারসাম্য বজায় রেখে ভাষাকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরই। এই রকম একটি পরিস্থিতিতে বাংলা শিক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। উক্ত স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

৮.২ উদ্দেশ্য ঃ

- বাংলা ভাষাকে নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করা।
- বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার দক্ষতা অর্জন।
- ব্যাকরণ সম্মত ভাষা ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা।
- ভাব বিনিময়ের ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহারিক কৌশল আয়ত্ত করা।
- ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব সমন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা।
- বিরাম চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার আয়ত্ত করা।
- দেশি-বিদেশি শব্দের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত করা।
- সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করা।
- জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।
- বাংলাভাষা শিক্ষণে শোনা-বলা-পড়া-লেখা-র স্তরসমূহের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা।

৮.৩ বহুভাষাভাষী ও বিবিধ সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বাংলা শিক্ষণ ঃ

প্রত্যন্ত গ্রাম ব্যতিরেকে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের শহর ও শহরতলীর সর্বত্র আজ বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করেন শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি শিশুর শিক্ষাগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত। এই সব ভিন ভাষাভাষীদের বহু শব্দ বাংলা

শব্দভাণ্ডারে অবলীলাক্রমে ঠাঁই পেলেও এদের শিক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারণে এরা বাংলা মাধ্যমের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকে ভর্তি হতে বাধ্য হয়। অথচ আধুনিক শিক্ষাবিদরা মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সমস্যা রয়েছে অন্যত্রও। এই রাজ্যে বা মাতৃভাষা এলাকায় বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা, আর্থ সামাজিক দিকের বিচারে যাদের অবস্থান উচ্চে তারা যুগোপযোগী চাহিদা ও জীবিকার স্বার্থে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে বা করছে। অর্থাৎ এক মাতৃভাষা বাংলা তারই ভৌগোলিক পরিসরের এক শ্রেণির কাছে প্রথম ভাষা, অন্য শ্রেণির কাছে দ্বিতীয় ভাষা। যাদের কাছে প্রথম ভাষা তারা বাংলা ভাষা শিক্ষণে ও শিখনে যতটা যত্নশীল, অন্য মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতে সেই একই ভাষা অনেকটাই উপেক্ষিত। এইরকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাংলা শিক্ষণের প্রকৃত সমাধান নির্ভর করে যাঁরা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে রয়েছেন তাঁদের উপর।

সমন্বিত ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের ধর্ম হল অপরের ভাষা ও সংস্কৃতিকে জানতে হবে, শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করবে, ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ভালো কিছু থাকলে তাকে সাদরে গ্রহণ করবে এবং সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে তাদের সুখে দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় সমান অংশীদারী হবে। সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, সমদর্শিতার নীতির উপর আস্থা রেখেই প্রত্যেকটি মানুষ নিজেকে সমাজের আদর্শ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়। পারস্পরিক গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই মিশ্র সংস্কৃতি শক্তিশালী রূপধারণ করে। সেকারণে মিশ্র ভাষাভাষী ও বিবিধ সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বাংলা শিক্ষণ কালে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে- কথ্য ভাষায় মিশ্রণ ঘটলেও যথাসম্ভব তাকে পরিহার করে বাংলা ভাষার নিজস্বতাকে বজায় রাখতে হবে। লেখার সময় যাতে ঐ জাতীয় মিশ্রণ না ঘটে তারজন্য ব্যাকরণের নিয়মনীতিকে অনুসরণ করতে হবে। শিশুর শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর থেকেই বাংলা শিক্ষণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শোনা-বলা-পড়া-লেখার স্তরগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। এরপর পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় শিশুর বাংলা ভাষাকে উন্নীত করে ব্যাকরণসম্মত ভাষার ব্যবহারে রপ্ত করানো দরকার। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষা শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে বাংলা ভাষা শিক্ষণকালে প্রয়োজনীয় কৌশল, পদ্ধতি ও উপকরণাদি ব্যবহার করে বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ সঞ্চার করা। একবার ভালোবাসা বা অনুরাগের সঞ্চার ঘটলে - মিশ্র সংস্কৃতির পরিসরেও বাংলা ভাষা ব্যবহার কালে সে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

অন্যদিকে বহুভাষাভাষী ও বিবিধ সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বাংলা শিক্ষণের সময় দুটি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকে মান্যতা দিতে হবে। কারণ মাতৃভাষা বাংলার প্রতি যেমন জোর দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি একথা ভাবা উচিত নয় যে শিক্ষার্থীরা কেবল মাতৃভাষা লিখতে ও পড়তে শিখবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য এবং জীবিকার বা কর্মসংস্থানের কারণে বিশ্বায়নের কথা মাথায় রেখে মাতৃভাষার পাশাপশি তাদের অন্যান্য ভাষাও আয়ত্ত করতে হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

- বাংলা ভাষা শিক্ষণের দুটি উদ্দেশ্য শিখুন।
- মিশ্র সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়?
- মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

প্রথম ভাষা হিসেবে বাংলা শিক্ষণ

সাধারণত যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারাই প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে। বাংলা ভাষাই তাদের শিক্ষার মাধ্যম। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষায় তারা যথাসম্ভব বাংলা পরিভাষা ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। সমাজের সঙ্গে সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে এই বাংলা ভাষাই তাদের কাছে প্রধান উপায়। বাংলার সমাজ পরিবেশে, বাংলাভাষী শিক্ষার্থীকে প্রথম ভাষা বাংলা শিক্ষণের পূর্বে শিক্ষকের যে বিষয়গুলি মনে রাখা আবশ্যক তা হল–

- বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের কাছে বাংলা ভাষা হল প্রাণের ভাষা। কবির ভাষায়- "এই ভাষাতেই প্রথম বোলে/ডাকনু মায়ে মা-মা বলে।"
- এই ভাষা মৌখিক ও লিখিতভাবে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ভাষা।

- শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, সৃজনীশক্তি এবং সৌন্দর্যবোধকে বিকশিত করার ভাষা।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভাষা।
- সামাজিকীকরণের ভাষা।

উপরিউক্ত কারণসমূহের জন্য প্রথমভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা শিক্ষণে যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া আবশ্যক তা হল-

- বাংলা ভাষার উৎস, বিবর্তন এবং বিকাশ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে হবে।
- বাংলা শব্দভাণ্ডারের ব্যাপকতার কারণ বুঝিয়ে বলতে হবে।
- ব্যাকরণ হল ভাষার বিজ্ঞান তাই বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।
- মৌখিক ও লিখিত উভয়ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ভাষা ব্যবহারের জন্য বিরাম চিহ্নের যথাযথ ব্যবহারে শিক্ষার্থীকে দক্ষ করে তুলতে হবে।
- মান্য বাংলা ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।
- ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মনীতি অনুসারে উচ্চারণের স্পষ্টতা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

শিক্ষা হল ত্রিমুখী প্রক্রিয়া। প্রথমে ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা শিক্ষণের সময় যে সব শর্ত পালন করতে হবে, তা হল—

পরিবেশ/বিদ্যালয় ঃ ভাষা শিক্ষার জন্য সুসজ্জিত ভাষা কক্ষ গড়ে তুলতে হবে। ভাষা গবেষণাগারে বিশিষ্ট লেখক, কবি, নাট্যকার, ভাষাবিদ যাঁরা বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাঁদের ছবি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

- বাংলা ভাষাভাষীর এলাকা চিহ্নিত ম্যাপ ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- ভাষাবংশে বাংলা ভাষার স্থান দেওয়ালে লিপিবদ্ধ থাকবে।
- বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে।
- বাংলা ভাষার গুরুত্ব নির্দেশকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি সম্বলিত চার্ট ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- সুশোভিত বঙ্গ প্রকৃতির একটি বড় আকারের ছবি ভাষা কক্ষে রাখতে হবে।
- ভাষা কক্ষে শব্দের প্রতিধ্বনি রোধের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ভাষা শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, সিডি ইত্যাদি রাখতে হলে

শিক্ষক ঃ প্রথম ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা শিক্ষণে শিক্ষককেও কিছু শর্ত পালন করতে হবে। শর্তগুলি হল–

- আগ্রহ সহকারে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে।
- যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পাঠ-দান করতে হবে।
- শ্রেণি, বয়স ও সামর্থ্য বিবেচনা করে ভাষা বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলি শেখাতে হবে।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সহায়তায় শিক্ষার্থীদের ভুল-ত্রুটিগুলিকে শনাক্ত করে সেগুলির সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার সহায়তায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান দিতে হবে।
- উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহাযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সহায়তায় ভাষার বিমূর্ত বিষয়গুলিকে মূর্ত করে তুলতে হবে।
- কৃষ্ণফলকের (Black Board) সহায়তায় কঠিন বানান, সন্ধি, সমাস, কারক বিভক্তির সম্যক ধারণা দিতে হবে।
- যুক্তিধর্মী বিশ্লেষণের সাহায্যে ভাষার শিক্ষা দিতে হবে।
- অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে অন্য বিষয়ের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে।

শিক্ষার্থী ঃ প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের সব দায়িত্ব পালন করতে হবে সেগুলি হল–

- ভাষাকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।
- আন্তরিকতার সঙ্গে ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করতে হবে।
- ধ্বনিতত্ত্বের ও রূপতত্ত্বের অন্তর্গত বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে।
- ভাষার শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
- বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
- বাংলা শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্যময়তা ও ব্যাপকতার বিষয়টিকে অনুধাবন করতে হবে।
- ভাষার ভুল প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।
- অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে ভাষার পাঠ গ্রহণ করতে হবে।
- ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।
- জীবন ও জীবিকার স্বার্থে ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

- বাংলা ভাষাকে কারা প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে?
- দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ভূমিকা কী?
- প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা শিক্ষণে কোন কোন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া দরকার?
- ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষকের গুরুত্ব কতখানি?
- উপযুক্ত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দায়িত্ব কোথায়?

৮.৫ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা শিক্ষণ-বিকাশমূলক আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদান সমূহ ঃ

প্রথম ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা শিক্ষার হাত ধরেই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। এই কারণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে বা রাজ্যে সমান্তরালভাবে দুটি ভাষার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম ভাষা তার সার্বিক বিকাশের পথকে ত্বরান্বিত করে, এই ভাষার সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাষা হল কর্মের ভাষা। জীবিকার স্বার্থে দ্বিতীয় ভাষাটি তাকে শিখতে হয়। কিন্তু বর্তমানে বাস্তব পরিস্থিতির বিচার করতে গেলে দেখা যাবে এর পিছনে অন্যান্য অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ হল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি।

আর্থ সামাজিক উপাদান ঃ

- আর্থ সামাজিক কারণে ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী লোকজন দরিদ্রতার কারণে এবং প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারণে তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে সাধারণ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে বাধ্য হন। ফলে এই সব ছেলেমেয়েদেরকে কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে আয়ত্ত করতে হয়।
- অন্য সমাজে বসবাস করতে গেলে সামাজিকীকরণের প্রয়োজনে দ্বিতীয় ভাষাকে রপ্ত করতে হয়।
- জীবিকার স্বার্থে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাটা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠে।

মনস্তাত্ত্বিক উপাদান :

বর্তমানে শিক্ষামনোবিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা শিক্ষা কিংবা অন্য যে কোনো বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল আগ্রহ, চাহিদা, পরিণমন, মনোযোগ ও সামর্থ্য।

আগ্রহ : কোনো কিছুই শেখানো যায় না যদি না শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে। সক্রিয়তার ভিত্তি হল আগ্রহ। আবার আগ্রহের উপর ভর করেই শিক্ষার্থীর চাহিদা ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

মনোযোগ : পরিণমন অনুসারে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। বয়ঃক্রমের উপর পরিণমন নির্ভরশীল, যে কোনো বিষয় শিক্ষণে পরিণমন ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

চাহিদা : চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে পাঠ দেওয়া উচিত। প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য সুচিন্তিত পাঠ্যবস্তু নির্বাচন করা উচিত এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষণরীতি নির্ধারণ করাই যুক্তিযুক্ত।

সামর্থ্য : সামর্থ্য বলতে বোঝায় গ্রহণের ও ধারণের ক্ষমতা। শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক সামর্থের উপর ভিত্তি করে শিক্ষণ কর্মে অগ্রসর হওয়া ভালো। শিক্ষার্থীরা যে যে কর্ম সম্পাদন করতে পারবে সেইরূপ কার্যসম্পাদনে তাদেরকে উৎসাহিত করা দরকার। বলতে দ্বিধা নেই, শিক্ষার ক্ষেত্রে মনন, চিন্তন, কথন এবং লিখনের ক্ষেত্রে সামর্থ্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়।

দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা শিক্ষণে যে কথাটি প্রথমে মনে রাখা দরকার তা হল নিয়মনীতির অনুশীলনের মাধ্যমে এই ভাষাকে আয়ত্ত করতে হয়। প্রথম ভাষায় শিক্ষার্থী নিজেকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারে আর দ্বিতীয় ভাষা পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সহায়ক।

পরিবেশ বা বিদ্যালয় ঃ বিদ্যালয় হল সামাজিক সংস্থা। সমাজে যেমন বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করে তেমনি সাধারণ বিদ্যালয়ে সকলের প্রবেশ অবাধ। অন্য ভাষার ছেলেমেয়েরাও যাতে নির্বিঘ্নে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করতে পারে তার জন্য বিধিসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের উদার মানসিকতা এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষকদের উদ্দেশ্য হবে ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক বাংলা ভাষা শিক্ষণে আগ্রহী করে তোলা এবং বাধা-প্রতিবন্ধতাকে অতিক্রম করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা।

শিক্ষক ঃ

- বয়ঃক্রম অনুযায়ী বাংলা ভাষা শিক্ষণকর্ম সম্পন্ন করা শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহের কথা মাথায় রেখে বাংলা শিক্ষণ পরিচালনা করা।
- বাংলা ভাষার গঠনগত স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।
- দ্বিভাষিকতার সাহায্যে বাংলা ভাষা শিক্ষণ দান করা।
- আর্থ-সামাজিক উপাদনের কথা স্মরণে রেখে বাংলা শিক্ষণে যত্নশীল হতে হবে।
- সহজ -সরল পদ্ধতির সহায়তায় বাংলা ভাষা শেখাতে হবে।
- দৃষ্টান্ত ও উপকরণের সাহায্যে বিমূর্ত বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে মূর্ত করে তুলতে হবে।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষার্থী ঃ

- বাংলা শিক্ষণে মনোযোগী হতে হবে।
- নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষার গঠনরীতি আয়ত্ত করার জন্য যত্নবান হতে হবে।
- জাতীয় সংহতি বজায় রাখার কারণে দ্বিতীয় ভাষা বাংলা শিক্ষণ জরুরি।
- বিশ্বায়নের যুগে স্থিতিশীল জীবন যাপনের কারণে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ অপরিহার্য।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

- প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য কী?
- ভাষা শিক্ষণে আর্থ সামাজিক উপাদান বলতে কী বোঝায়?

- ভাষা শিক্ষণের মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি কি কি?
- দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণে পরিবেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
- দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

৮.৬ প্রথম ভাষা আত্মস্থ করণের মূল উপকরণ সমূহ ঃ

যে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে গেলে যেমন কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কার্য সম্পাদন করতে গেলে কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয়। প্রথম ভাষা আত্মস্থকরণের মুখ্য উপকরণগুলি হল ঃ

- সুশোভিত অলঙ্কৃত পাঠ্যপুস্তক, যা দেখে শিক্ষার্থী পাঠে আগ্রহী হয়ে উঠবে।
- বর্ণ পরিচিতি ও শব্দ গঠনের জন্য বিভিন্ন আকারের ও রঙের বর্ণলিপি, যা নাড়াচাড়া করতে করতে শিশু শিক্ষার্থী খেলার মাধ্যমেই ভাষার সঙ্গে পরিচিতি হবে। এর সঙ্গে শব্দের সহায়তায় যে বস্তুকে আমরা বোঝাতে চাই তার প্রতিকৃতি থাকলে আরও ভালো হয়।
- ব্ল্যাকবোর্ড, চক এবং ডাস্টার, ভাষা শিক্ষার অপরিহার্য উপকরণ। মাত্রাযুক্ত, মাত্রা ছাড়া, অর্ধমাত্রা (অংশমাত্রা) বর্নের সঙ্গে পরিচয় সাধনে, যুগ্মব্যঞ্জন ও যুক্তব্যঞ্জনের পার্থক্য বোঝাতে, সন্ধি-সমাস-কারক নিরূপণে ব্ল্যাকবোর্ডের তুলনা নেই। এছাড়া ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ও ভাষার বিবর্তন বোঝাতে ও বুঝতে গেলেও ব্ল্যাকবোর্ডের সহায়তা অপরিহার্য।
- শিক্ষার্থীর বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের চার্ট এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। যেমন- বর্ণের পাশে বর্ণ সম্বন্ধীয় বস্তুর বা বিষয়ের প্রতিকৃতিযুক্ত চার্ট, ছড়ার সাহায্যে ভাষা শিক্ষণের চার্ট, এক জাতীয় শব্দের চার্ট ইত্যাদি।
- ইন্দ্রিয় শিক্ষণের ব্যবস্থা। প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ভাষা আত্মস্থকরণের জন্য ইন্দ্রিয় শিক্ষণের ব্যবহার রাখতে হবে। শ্রবণের দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা যাতে সে অনেককিছু শিখতে পারে।
- ভাষা শিক্ষার জন্য প্রয়োজন একটি সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ বা ভাষা গবেষণাগার।
- ভাষা আত্মস্থকরণের অন্যতম উপকরণ হলেন দক্ষ ভাষা শিক্ষক। যাঁর অনুপ্রেরণায়, আদর্শে, আন্তরিকতায় শিক্ষার্থীরা ভাষা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে।
- ভাষার আয়ত্তীকরণের আন্যান্য উপকরণ হল ধ্বনি, শব্দ, পদ ও বাক্য। এক কথায় ভাষার ব্যাকরণ, যার সাহায্য ব্যতীত ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ধ্বনি ও শব্দের প্রকার ভেদ, পদ ও বাক্যগঠনের রীতি ও ধরন আয়ত্ত করতে না পারলে আমরা কোনো ভাবেই নিজেকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারিনা।
- বিভিন্ন উপভাষার এলাকাসহ ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য, ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি-নীতি, বাগ্ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার সম্পর্কিত ধারণা, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের বিষয়গুলি ভাষাকে সুষ্ঠুভাবে আত্মস্থকরণের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এসবের ব্যবহার ঘটিয়ে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়।
- শ্রেণিতে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার।
- বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান। যেমন — বিতর্ক, বক্তৃতা ইত্যাদি।

৮.৭ বাংলা ভাষা শিক্ষণ সূচনায় বয়ঃক্রমজনিত প্রেক্ষিত বিবেচনা ঃ

ভাষা শিক্ষণে স্তর বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ ভাষা বহতা নদীর মতো পরিবর্তনশীল। ভাষা শিক্ষার বিষয়টি এমনিতেই জটিল। তাই শিক্ষার্থীর মানসিক সামর্থ্য, গ্রহণক্ষমতা ও ধারণক্ষমতার সাপেক্ষে ভাষা শিক্ষণের বিষয়টি পরিচালিত হওয়া দরকার। শিশুর ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রকে নিম্নলিখিত স্তরগুলিতে বিভক্ত করা হয় ঃ

- প্রাক্ প্রাথমিক স্তর (২ বছর থেকে ৫ বছর)
- প্রাথমিক স্তর (৬ বছর থেকে ১০ বছর)

- নিম্নমাধ্যমিক স্তর (১১ বছর থেকে ১৩ বছর)
- মাধ্যমিক স্তর (১৪ বছর থেকে ১৫ বছর)
- উচ্চমাধ্যমিক স্তর (১৬ বছর থেকে ১৮ বছর)

প্রাক্ প্রাথমিক স্তর ঃ বুলি ফোটার বয়স। এই স্তরে শিশুর উচ্চারণে জড়তা থাকা স্বাভাবিক। আধো-আধো বুলির সাহায্যে সে নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতে চায়, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। তার নমনীয়তাকে কাজে লাগিয়ে মায়েরা তাদের সযত্ন প্রচেষ্টা ও সস্নেহ ভালোবাসায় শিশুর ভাষা ব্যবহারকে যথাযথ ও সার্থক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এই স্তরটি প্রস্তুতির স্তর হিসেবে পরিচিত। আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রকাশ, সামাজিকতা, ভাষাব্যবহার ও লেখা পড়া সবকিছুরই ভিত্তি রচিত হয় এই সময়েই। শিশু তার মা-বাবা-আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকেই এই স্তরে ভাষা শিক্ষা লাভ করে। এছাড়া শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। অনুকরণের সাহায্যেই সে ভাষা ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করে। সামনে তার নতুন জগৎ; ধীরে ধীরে অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা তার তীব্র। তার সঙ্গী সাথির সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই সময় ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন তীব্র হয়, সে ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হয়। তার মধ্যে দেখা যায় কথার স্রোত, কিন্তু ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ায় প্রায়শই সে ভুলে যায়। প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে তাই শিশুর মানসিকতা লক্ষ্য করেই ভাষা শিক্ষা দিতে হবে।

প্রাথমিক স্তর ঃ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই স্তরের অর্থাৎ ৬ বছর থেকে ১০ বছর বয়েসের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) গুরুত্ব খুব বেশি। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। এদের সঙ্গী সাথির সংখ্যা বাড়ে, ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে। এদের মধ্যে পরীক্ষায় পাশ-ফেলের ভীতি দেখা যায়। লেখার দক্ষতা ও দ্রুততা বৃদ্ধি পায়। ধারণক্ষমতার বৃদ্ধিতে সংগৃহীত শব্দের সংখ্যাও বাড়ে। প্রাক্ বয়ঃসন্ধির এই পর্বে আশা, উৎসাহ, চাঞ্চল্য, চাপল্যের উদ্দামতাকে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথোচিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। ভাষা শিক্ষার জন্য এই সময়ে করণীয় পদক্ষেপ হল– উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, গল্প, কবিতা, টুকিটাকি ভ্রমণের কথা লেখার উপর গুরুত্ব প্রদান, সরব পাঠে উদ্বুদ্ধ করা, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া পাঠাগার থেকে তাদের উপযোগী বই পড়ায় উৎসাহ জোগানো, শিশুদের জন্য প্রকাশিত সাময়িক পত্র পাঠে অনুপ্রাণিত করা। মোট কথা, বৌদ্ধিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে নির্ভুল শব্দ লেখা, সুষ্ঠু উচ্চারণ ভাষা ব্যবহারের কৌশল আয়ত্তীকরণে, সৃজনশীল কর্মে অনুপ্রাণিত করার বিষয়গুলিকে অধিকতর প্রাধান্য দিতে হবে। এক কথায় তাদের উচ্ছলতা ও আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে।

নিম্নমাধ্যমিক স্তর ঃ বয়ঃসীমা ১১-১৩ বছর। বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি হল নিম্নমাধ্যমিক স্তর। এই স্তর বয়ঃসন্ধিকালের সঙ্গমতীর্থ। দেহে ও মনে পরিবর্তনের ছোঁয়া, যন্ত্রণাকাতর মানসিকতায় অনন্ত জিজ্ঞাসা, অদম্য উৎসাহে ও আগ্রহে এরা ব্যাকুল। এই বয়সের শিক্ষার্থীরা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে চায়। জটিল মানসিকতায় উদ্‌গতিসাধন ঘটিয়ে তাদের বিচিত্র মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে এই স্তরে ভাষা শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

লেখা পড়ার ক্ষেত্রে এরা অনেকেই অগ্রসর হয়েছে। এই স্তরে ভাষা শিক্ষায় প্রথম ও প্রধান কাজ হবে সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় উৎসাহ প্রদান। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির সার্থক প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বয়ঃসন্ধিকালের যন্ত্রণাকাতর মন সৌন্দর্যলোকের স্বাদ পাবে। বিদ্যালয়ে দেওয়াল পত্রিকা ও মুদ্রিত পত্রিকার মাধ্যমেই তাদের সুযোগ দিতে হবে। সহানুভূতিশীল মানসিকতা নিয়ে শিক্ষককে কাঁচা হাতের লেখাগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পরিমার্জন করতে হবে। উৎকৃষ্ট লেখাগুলিকে বাছাই করে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে গুছিয়ে বলার জন্য, নির্ভুলভাবে লেখার জন্য, শব্দ চয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, যথাযথ উচ্চারণের জন্য ব্যাকরণের যে যে অংশগুলি অপরিহার্য সেই অংশগুলির অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া তাদের কল্পনাশক্তি ও বৌদ্ধিক শক্তি বিকাশের জন্য গল্প, কবিতা ও বিজ্ঞানধর্মী রচনাপাঠে উৎসাহিত করতে হবে। তবেই তার ভাষা শিক্ষণের ভিত্তিটি সুদৃঢ় হবে।

৮.৮ সারসংক্ষেপ ঃ

বহু ভাষা ভাষী ও বিবিধ সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বাংলা শিক্ষণে প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষার প্রসঙ্গটি একান্তই অপরিহার্য। বাংলা

ভাষা শিক্ষণে প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণে জীবনের ভাষা ও জীবিকার ভাষার সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও আত্মপ্রকাশের ও সামাজিকীকরণের নিরিখে উভয় ভাষা শিক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপগুলিতে বিশেষ তারতম্য অনুভূত হয় না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং পরিবেশের সার্থক সমন্বয়নে ও যথাযথ দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ঐকান্তিকতায় ভাষা শিক্ষণের বিষয়টিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে স্তরভিত্তিক এবং বয়ঃক্রম ভিত্তিক ভাষা শিক্ষণের নীতি গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক উপাদান সমূহের কথা বিবেচনা করে মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষণের উপর জোর দেওয়া দরকার।

৮.৯ অনুশীলনী

১. **সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন ঃ**

(ক) পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী অধিকাংশ বাঙালী ছেলেমেয়েদের প্রথম ভাষা হল–

(i) ইংরেজী (ii) বাংলা (iii) হিন্দি (iv) উর্দু।

(খ) শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়–

(i) ৪ বছর বয়সে (ii) ৫ বছর বয়সে (iii) ৩ বছর বয়সে (iv) ৬ বছর বয়সে।

(গ) বহুভাষাভাষী শিক্ষার্থীর আধিক্য দেখা যায়–

(i) গ্রামাঞ্চলে (ii) শহরাঞ্চলে (iii) শিল্পাঞ্চলে (iv) কোনোটিতেই নয়।

(ঘ) ভাষা শিক্ষার জন্য গৃহীত মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি হল–

(i) চাহিদা (ii) আগ্রহ (iii) মনোযোগ (iv) সবগুলি

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়ঃক্রম কত?

(খ) প্রথম ভাষা আত্মস্থকরণের উপকরণগুলি কি কি লিখুন।

(গ) প্রথমভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও পার্থক্য বিশ্লেষণ করন।

(ঘ) ভাষা শিক্ষার স্তরগুলি উল্লেখ করুন।

(ঙ) সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা কোথায়?

৩. **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) বহুভাষাভাষী ও বিবিধ সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করুন।

(খ) প্রথম ভাষা আত্মস্থকরণের মূল উপকরণসমূহের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(গ) প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষার প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালনা করা উচিত লিখুন।

(ঘ) শ্রেণি কক্ষে ভাষা শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করে তুলতে প্রয়োজনীয় কৌশলগুলি আলোচনা করুন।

(ঙ) ভাষা শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

অধ্যায়

৯

ভাষার স্বরূপ

৯.১ সূচনা

মানুষ সমাজবন্ধ জীব। সামাজিক প্রাণী হিসেবে এদের সঙ্গে অপরের ভাববিনিময়ের মাধ্যম হল ভাষা। ভাষা হল মানুষের অন্তরের সম্পদ, তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রতীক। ভাষার কারণেই অন্যান্য প্রাণীকুল থেকে মানুষ স্বতন্ত্র। ভাষা চিন্তনের ও মননের বাহন। ভাষিক শক্তির বলেই মানুষ আজ বিঘ্নজয়ী এবং বিশ্বজয়ী। সংস্কৃতির মুখ্য উপাদান হল ভাষা।

৯.২ উদ্দেশ্য ঃ

- মাতৃভাষা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি
- মাতৃভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার পার্থক্য নিরূপণ
- অন্য ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন
- ভাষা আয়ত্তীকরণের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় দক্ষতা অর্জন
- শ্রেণিকক্ষে প্রজ্ঞার নির্মাণ
- ভাষাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা

৯.৩ ভাষা বলতে কী বোঝায় ?

‘ভাষ’ ধাতুর উত্তর ‘আ’ প্রত্যয় যোগ করে ‘ভাষা’ শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। ‘ভাষ’-ধাতুর অর্থ বলা বা ব্যক্ত করা। বর্তমানে ভাষা বলতে বলতে আমরা বুঝি মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টিকে, ভাষা মানুষের সচেতন মনের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি।

ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভাষাতত্ত্ববিদেরা তাঁদের আপনাপন ধারণা ব্যক্ত করেছেন। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধায় বলেছেন, – ‘‘মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন পদসমষ্টিকে ভাষা বলে।’’ ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন– ‘‘মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।’’ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার বলেছেন– ‘‘ভাষা চিন্তার প্রতীক।’’ বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট (Edgar Howard Sturtevant) -এর মতে– “A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a special group co-operate and interact.”

মানুষের ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন। তথাপি ভাষাবিদ্‌দের ধারণাগুলিকে একত্রিত করলে ভাষার যে কয়েকটি লক্ষণ উহ্য হয়ে উঠে তা হল–

(i) ভাষা পরস্পর ভাব বিনিময়ের মাধ্যম।

(ii) এই পারস্পরিকতা বিশেষ একটি সমাজ বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(iii) ভাষা ধ্বনি প্রতীকের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস ব্যবস্থা।

(iv) ভাষার ধ্বনি প্রতীকগুলি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত।

উপরিউক্ত সংলক্ষণের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি– স্পষ্ট উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি তথা শব্দের সাহায্যে মানুষ যখন পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে, তখনই তাকে বলা হয় ভাষা।

৯.৩.১ প্রথম ভাষা ঃ

প্রথম ভাষা বলতে আমরা সেই ভাষাকেই বুঝি যে ভাষায় শিশু জন্মের পর থেকে বিনা আয়াসেই শেখে। সাধারণত মাতৃভাষাই হল প্রথম ভাষা। কোঠারি কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) Three Language Formula তে ও মাতৃভাষার পক্ষে সমর্থন রয়েছে।

উপরিউক্ত ধারণানুযায়ী যে ব্যক্তির মাতৃভাষা বাংলা তার প্রথম ভাষা বাংলা। যার মাতৃভাষা হিন্দি তার প্রথম ভাষা হিন্দি।

প্রথম ভাষা হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব ভাষা। এই ভাষায় আমরা ভাবগ্রহণ ও প্রকাশ করে তৃপ্তি পাই। এই ভাষায় বলা, পড়া, লেখা সহজ। প্রথম ভাষার ব্যবহারেই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হয়। এই ভাষা সামাজিকীকরণে বিশেষ সহায়তা করে এবং সামাজিক ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তোলে। স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিশনই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা তথা প্রথম ভাষাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'।

৯.৩.২ দ্বিতীয় ভাষা ঃ

মাতৃভাষা ছাড়া ব্যক্তি, জাতি বা সমাজের স্বার্থে যে ভাষাটি আয়ত্ত করতে হয় তা হল দ্বিতীয় ভাষা। ভারতে বসবাসকারী বহু মানুষের দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি অথবা ইংরেজি। রবীন্দ্রনাথের মতে– 'এই ভাষা তাদের কাছে কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয়। দ্বিতীয় ভাষা হল যোগাযোগের ভাষা, গ্রন্থাগারের ভাষা। দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষাও বিদ্যালয়েই হয়ে থাকে।

৯.৩.৩ বিদেশি ভাষা ঃ

সাধারণত নিজের দেশে ব্যবহৃত ভাষা ছাড়া সব ভাষাই বিদেশি ভাষা। ভারতবাসীর কাছে ইংরেজি, গ্রিক, লাতিন, ফরাসি সবই বিদেশি ভাষা। এখানে বিদেশি ভাষা বলতে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ভাষার কথা বলা হয়েছে। বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন-প্রযুক্তিবিজ্ঞানে জ্ঞান অর্জন করার জন্যই বিদেশি ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে বিদেশি ভাষা শিক্ষাটা জরুরী হয়ে পড়েছে।

৯.৪ আদান প্রদান ও চিন্তনের মাধ্যম হিসেবে ভাষা ঃ

ভাষা হল পারস্পরিক ভাববিনিময়ের মাধ্যম। আদান-প্রদান বলতে ভাবের আদান প্রদানকেই বোঝানো হয়। কথ্য এবং লিখিত উভয়ভাবেই আমরা ভাবের আদান প্রদান করি। স্বাভাবিকভাবেই আদান প্রদান ও চিন্তনের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষার গুরুত্বই সর্বাধিক। অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে মাতৃভাষায় আমরা যেমন ভাবের আদান-প্রদান করতে পারি তেমনি চিন্তন শক্তির বিকাশেও মাতৃভাষা অদ্বিতীয়। মাতৃভাষা তৃপ্তিকর। চিন্তাশক্তিকে শক্তিশালী করতে, মননশীলতাকে সুতীক্ষ্ণ করতে, সৃজনশীল সত্তার প্রকাশে এবং বোধশক্তির জাগরণে মাতৃভাষার বিকল্প নেই।

ভাষার শক্তি অসীম। ভাষার জন্যই সভ্যতার অগ্রগতি। ভাষাকে বাদ দিলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি পঙ্গু। ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার হল ভাষা। ভাষার সাহায্যেই আমরা অতীতকে জানি, বর্তমানে অবস্থান করি, ভবিষ্যতের জন্য স্বপিল কল্পনার ছবি আঁকি।

৯.৫ ভাষা আয়ত্তীকরণ, ভাষা শিক্ষক-শিখন ঃ

৯.৫.১ ভাষা আয়ত্তীকরণ ঃ ভাষা আয়ত্তীকরণ বলতে বোঝায় ভাষাকে ঠিকমতো প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা ভাষা শিখি। এক্ষেত্রে পরিবার পরিজন, পরিবেশ ভাষা শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু ভাষার প্রকৃতি বা স্বরূপ না জেনে, ভাষা শিখনের প্রক্রিয়াকে না মেনে যদি ভাষা আয়ত্তীকরণের কথা ভাবি তাহলে তা হবে অর্থহীন।

ভাষা আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল **ভাষার ব্যাকরণ**। ব্যাকরণের নিয়মকানুন মেনে ভাষা শিখলে শিক্ষার্থীর ভাষা ব্যবহারে আত্মপ্রত্যয় বাড়ে, ভাষার শুদ্ধতা বজায় থাকে, শব্দ তৈরির কৌশল আয়ত্ত হয়, ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়, সহজ-সরল প্রাঞ্জলতার সঙ্গে আমরা তার প্রকাশ ঘটাতে পারি, ভাষার অস্তিত্ব সুরক্ষিত হয়, ভাষায় ভুলের অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ হয়, গুরুচণ্ডালী রীতি পরিহার করা যায়, ভাষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় উপাদান হল **পরিবেশ**। ভাষা আয়ত্তীকরণের জন্য চাই অনুকূল পরিবেশ। শ্রবণ-কথন-পঠন-লিখন-ভাষা আয়ত্তীকরণে যা অপরিহার্য তার চর্চার পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয় তাহলে ভাষা আয়ত্তীকরণে বাধার সৃষ্টি হবে। আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আকর্ষণীয় পদ্ধতির সহায়তায় শিশু শিক্ষার্থীকে ভাষা শিক্ষায় আকৃষ্ট করতে হবে। তবেই তারা তার পুনরাবৃত্তি করে সচেতনভাবে ভাষা আয়ত্তীকরণে সচেষ্ট হবে।

তৃতীয় উপাদান হল **উপকরণের ব্যবহার**। উপযুক্ত উপকরণাদির ব্যবহারে শিক্ষার্থী খুব দ্রুত ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারে, সাবলীলভাবে প্রকাশ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল **জীবন ও জীবিকার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ স্থাপন**। ভাষার ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা থাকলে শিক্ষার্থী আপন প্রয়াসেই ভাষার আয়ত্তীকরণে সচেষ্ট হবে, সঠিক ভাষা ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন করবে।

৯.৫.২ ভাষা শিক্ষক-শিখন ঃ

শিক্ষার্থীর ভাষা শিখনে ভাষা শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম। ভাষা বিষয়টি জটিল। সরসতার সঙ্গে না শেখালে শিক্ষার্থীরা শিখতেই চায় না। তাই ভাষাশিক্ষার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে গেলে এবং শিখনকে কার্যকরী করে তুলতে গেলে শিক্ষকের যা করণীয় তা হল—

- ভাষা শিখনের আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকবে।
- শিক্ষককে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হতে হবে।
- ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট এবং উপকরণ সহযোগে ভাষার দুর্বোধতাকে সহজ সরল করে তুলতে হবে।
- আকর্ষণীয় আধুনিক পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে স্তরানুযায়ী ও বয়ঃক্রম অনুযায়ী ভাষা শিখনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদাহরণ সহযোগে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করে তুলতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের সমস্যার ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে।
- বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝাতে হবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণ শক্তির অধিকারী হতে হবে।
- মান্যরীতির সঙ্গে আঞ্চলিক রীতির পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।
- ভাষার ক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করতে হবে।
- ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকবে।
- ভাষার পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকবে।

উপরিউক্ত দায়িত্বগুলি যদি সঠিকভাবে শিক্ষক পালন করেন তাহলেই ভাষা শিখনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

- ভাষার সংজ্ঞা দিন।
- প্রথম ভাষা বলতে কী বোঝেন?
- বিদেশি ভাষা শেখা কেন প্রয়োজন?
- ভাষার আয়ত্তীকরণ বলতে কী বোঝায়?
- ভাষা শিক্ষকের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৯.৬ শ্রেণিকক্ষে প্রজ্ঞার নির্মাণ ঃ

প্রজ্ঞা হল সেই জ্ঞান যা বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ ধারণা দানে সহায়তা করে। জ্ঞান যখন ব্যবহৃত হয়ে ব্যক্তিকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে তখন সেই অবস্থাকেই প্রজ্ঞা বলে।

শ্রেণিকক্ষে প্রজ্ঞার নির্মাণ বলতে বোঝায় শ্রেণিতে পাঠদানের জন্য নির্বাচিত একক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্বচ্ছ ধারণা গঠন বা নির্মাণ। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের আন্তরিক প্রয়াসেই কাজটি সুসম্পন্ন হয়।

প্রজ্ঞাকে জানতে গেলে জ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করতে গেলে দাঁড়ায়–

একজন শিক্ষার্থীর যে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান আছে অন্যত্র সেই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে যখন সমস্যার সমধান করতে সক্ষম হয় তখন বুঝতে হবে জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে। অথবা কোনো বিষয়ে শিক্ষক পরিকল্পনামতো শ্রেণিতে পাঠদানের পর মূল্যায়নের সময় যদি দেখেন যে শিক্ষার্থীরা তাঁর পাঠদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তাঁর প্রশ্নের উত্তরটিকে নিজস্ব ধারণার সাপেক্ষে গুছিয়ে উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে তখন জানতে হবে তার মধ্যে প্রজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে।

কোনো বিষয়ে প্রজ্ঞা জন্মালে সেই বিষয়ের জ্ঞান একত্রে সংগঠিত হয়ে তৈরি হয় একটি মানসিক প্রতিরূপ। সেই প্রতিরূপ স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয় এবং প্রয়োজনে তার পুনরুদ্রেক ঘটানো যায়।

পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ফলে সংগঠনটি আরও বেশি সক্রিয় হয়। যাকে বলা হয়, ‘স্কিমা’ (Schema)। এই ‘স্কিমা’ হল প্রজ্ঞার একক। একটি স্কিমার সঙ্গে অন্য একটি স্কিমা গঠিত হয়ে নতুন প্রজ্ঞার একক গঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা থাকে। শ্রেণিকক্ষের পাঠে পাওয়া নতুন তথ্য যুক্ত হয়ে একটি স্কিমা গঠন করে। এভাবেই শিক্ষার্থীর মনে নতুন নতুন স্কিমা তৈরি হতে থাকে এবং প্রজ্ঞায় পরিণত হয়।

৯.৭ ভাষা সমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ অথবা ভাষা গবেষণাগারের গুরুত্ব অনুধাবন ঃ

ভাষাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ বলতে বোঝায় ভাষা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামে পরিপূর্ণ শ্রেণিকক্ষ। সুসজ্জিত ভাষাকক্ষ সম্বন্ধে আলোচনায় এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু সেগুলির তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল।

ভাষাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষে থাকা দরকার–

- একটি বাগ্‌যন্ত্রের ছবি।
- মাত্রাযুক্ত, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণের তালিকা।
- দুরূহ শব্দের বানানের তালিকা
- আ-কার, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, এ-কার, ও-কার, ঔ-কার-এর (া, ি, ী, ু, ূ, ে, ো, ৌ) তালিকা।
- বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকদের ছবি।
- ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।
- ভাষার অভিধান
- নির্দিষ্ট ভাষা এলাকার মানচিত্র।
- উল্লেখযোগ্য ভাষা অথবা সংবিধান স্বীকৃত ভাষার তালিকা।
- ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এমন কবি-সাহিত্যিকের বাণীসমৃদ্ধ ছবি ইত্যাদি।

ভাষাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষের গুরুত্বগুলি নিম্নরূপ ঃ

- ভাষা শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীদের কথনে, পঠনে ও লিখনের সংশোধনে সাহায্য করে।
- শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী করা সহজ হয়।
- ভাষা শিক্ষায় প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

- অন্যান্য ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার পার্থক্য অনুধাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- ভাষার ব্যবহারে আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

- প্রজ্ঞা বলতে কী বোঝেন?
- একটি ভাষাকক্ষে কি কি থাকা প্রয়োজন?
- ভাষা শিক্ষায় ভাষাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

৯.৮. সারসংক্ষেপ ঃ

ভাষা হল ভাবের বাহন, আমাদের চিন্তনের প্রতিরূপ। ভাষার কারণেই অন্যান্য প্রাণীকুলের থেকে মানুষ স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে ভাষার গুরুত্ব অসীম। জন্মসূত্রে, কর্মসূত্রে ও বিশ্বায়নের পটভূমিকায় প্রথম ভাষা , দ্বিতীয় ভাষা এবং বিদেশি ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সহায়তায় ভাষাকে আয়ত্ত করতে হয়। যথার্থ ভাষা শিক্ষায় ভাষা শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা শিক্ষায় প্রয়োজন ভাষাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ এবং অনুকূল পরিবেশ।

৯.৯ অনুশীলনী

১. **সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ**

(ক) 'ভাষা চিন্তার প্রতীক'– ধারণাটি

(i) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের (ii) সুকুমার সেনের (iii) পরেশচন্দ্র মজুমদারের (iv) ম্যাক্সমুলারের।

(খ) Three Language Formula-র কথা বলেন

(i) কোঠারি কমিশন (ii) মুদালিয়র কমিশন (iii) রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (iv) অশোক মিত্র কমিশন

(গ) ভাষা আয়ত্তীকরণে প্রয়োজনীয় উপাদান হল

(i) ভাষার ব্যাকরণ (ii) অনুকূল পরিবেশ (iii) সহায়ক উপকরণ (iv) সবকটিই।

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষার মধ্যে পার্থক্য কী?

(খ) ভাষাকে অসীম শক্তিশালী বলা হয় কেন?

(গ) ভাবের আদান-প্রদানে ভাষার ভূমিকা কী?

(ঘ) ভাষাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ বলতে কী বোঝায়?

৩. **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) মাতৃভাষা বলতে কী বোঝায়?

(খ) শ্রেণিকক্ষে ভাষা শিক্ষকের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

(গ) শ্রেণিকক্ষে প্রজ্ঞার নির্মাণ বলতে কী বোঝায়?

(ঘ) ভাষাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষের বর্ণনা দিন।

(ঙ) বর্তমান বিশ্বে বিদেশি ভাষা অপরিহার্য কেন?

অধ্যায়

১০

মূল্যায়ন

বিষয়বস্তু :

- নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক মূল্যায়ন
- মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন
- কার্যসম্পাদনামূলক মূল্যায়ন
- অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যায়ন
- পারদর্শিতার অভীক্ষা ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ
- ব্লু-প্রিন্ট (খসড়া পত্র)
- দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র তৈরি এবং এককভিত্তিক নমুনা প্রশ্নপত্র সৃজন।

১০.১ সূচনা

শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার অন্যতম লক্ষ্য হল ব্যক্তি শিক্ষার্থীর আচার-আচরণের পরিবর্তন সাধন ঘটিয়ে তাকে সামাজিক মানুষে পরিণত করা। অর্থাৎ সমাজ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতা, আগ্রহ ও অভিরুচি সম্পর্কে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সাধন করাই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই পরিবর্তন ঠিকমতো সাধিত হল কিনা তা পরিমাপের জন্যই মূল্যায়নের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও প্রয়োগশক্তি, সামর্থ্য ও কৌশল সম্পর্কীয় স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি 'পরীক্ষা' নামক সংকীর্ণ প্রথায় যথাযথ প্রকাশ পায় না। এ কারণে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 'মূল্যায়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

মূল্যায়ন হল শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষার প্রভাব ও তার ফলশ্রুতি যাচাই করার উপায়। অর্থাৎ বিষয়কেন্দ্রিক অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে পড়ুয়ার শারীরিক ও মানসিক গুণের সংযোজন ক্ষমতা, সামর্থ্য, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন এবং তার আচার-আচরণের যোগ্যতা নিরূপক সিদ্ধান্তই হল মূল্যায়ন।

১০.২ উদ্দেশ্য ঃ

- নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক মূল্যায়নের ধারণার সঙ্গে পরিচিতি।
- মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়নের প্রক্রিয়া অনুধাবন।
- কার্যসম্পাদনমূলক মূল্যায়ন সম্পর্কে অবগতি।
- অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যায়ন সম্বন্ধে ধারণালাভ।
- পারদর্শিতার অভীক্ষা ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া অনুধাবন।
- ব্লু-প্রিন্ট বা খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা।
- দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র এবং এককভিত্তিক প্রশ্নপত্র তৈরি করা।

১০.৩ নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ঃ (Continuous and Comprehensive Evaluation)

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বৎসরব্যাপী সুপরিকল্পিত অনুশীলনের মাধ্যমে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সহায়তায় শিক্ষার্থীর জীবনে কী কী পরিবর্তন সংসাধিত হল, তা যাচাই করাই হল মূল্যায়ন। একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টিকে যদি প্রকাশ করা হয় তাহলে দাঁড়ায় ঃ

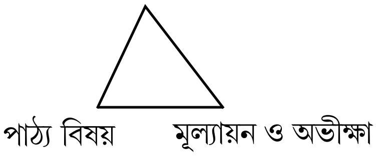

১০.৩.১ নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ঃ

শিক্ষা হল এক জীবন্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া। পর্যায়ক্রমিক ক্রমোন্নত ধারা অনুসরণে তা এগিয়ে যায়। শিক্ষার অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য এক একটি পাঠ একক আয়ত্ত করে এগোতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি পাঠ এককের সফল অনুশীলন পরবর্তী পাঠ-একক অনুশীলনের প্রাথমিক শর্ত। এই কারণে প্রতিটি পাঠ-একক অনুশীলনের পরই দেখে নেওয়া প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মধ্যে কাম্য শিখন সামর্থ্যের বিকাশ ঘটেছে কিনা। একক মূল্যায়ন হল এই কাজের প্রধান হাতিয়ার। মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ধরা পড়লে তার জন্য সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করে পরবর্তী পাঠ-একক শুরু করা যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির পথে একক মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য পাশ-ফেল চিহ্নিত করা নয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও দলগত দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক সংশোধনের ব্যবস্থা করা। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের অপর উদ্দেশ্যটি হল পাঁচ বছরের (প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) অবিচ্ছেদ্য শিক্ষাব্যবস্থায় পিছিয়ে-পড়া ছাত্র-ছাত্রী যে যে বিষয়ে বা কাজে পিছিয়ে রয়েছে, তাদের সেই কাজে বা বিষয়ে উপযুক্ত হয়ে উঠতে সহায়তা করা। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখেছে এবং কতটুকু তার আয়ত্ত করতে বাকি আছে,– এটা জানাই উক্ত মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। সারা বছর ধরে এই মূল্যায়ন হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরাও তৎপর থাকে, পাঠে ফাঁকি দিতে সাহস পায় না। এই সব কারণে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন বিশেষ কার্যকরী রূপ গ্রহণ করেছে।

১০.৩.২ সামগ্রিক মূল্যায়ন ঃ গৃহীত কর্মসূচির শেষে এই মূল্যায়ন কার্য অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য হল কোনো বিষয় বা বিষয়ের অংশবিশেষের পঠন-পাঠনের শেষে শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট গ্রেড বা মান দেওয়া। সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রধান ঝোঁক শিক্ষার্থী কতটুকু শিখতে পেরেছে তার উপর, কতটুকু পারেনি তার উপরে নয়। সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে মূল্যায়ন কর্ম সম্পাদন করা হয়।

(ii) মূল্যায়ন হল বিচারমূলক।

(iii) বিষয় পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত মূল্যায়ন।

(iv) শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার গুণগত মান নির্ধারণ সাপেক্ষ মূল্যায়ন।

(v) মূল্যায়ন সমষ্টিগত।

সাধারণত স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা বা কোনো একটি শিক্ষাস্তরের শেষে গৃহীত বোর্ডের পরীক্ষা সামগ্রিক মূল্যায়নের অন্তর্গত।

১০.৪ মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন ঃ (Oral and Written Evaluation)

১০.৪.১ মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন

মৌখিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ও উত্তর সবই মৌখিকভাবে নিষ্পন্ন হয়। এই জাতীয় পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে পরীক্ষকের সামনে উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে হয়। এখানে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশক্ষমতা ও জ্ঞানের গভীরতা প্রভৃতি বিচার করা হয়। প্রাচীনকাল থেকে এই পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানেও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে।

মৌখিক পরীক্ষার পদ্ধতির সুবিধা ঃ

(i) অল্প সময়ে জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করা যায়।

(ii) বাচনভঙ্গি, গুছিয়ে বলার ক্ষমতা, বোঝানোর ক্ষমতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির ক্ষমতা যাচাই করা যায়।

(iii) শিক্ষক স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারেন।

(iv) শিক্ষার্থীর অনুরাগের বিষয় যাচাই করা যায়।

অসুবিধা ঃ

(i) এই জাতীয় পরীক্ষা ব্যক্তিসাপেক্ষ নির্ভর।

(ii) সমদর্শিতা বজায় থাকে না।

(iii) অর্জিত জ্ঞানের প্রকৃত পরিমাপ সম্ভব হয় না।

(iv) তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কম কার্যকর।

(v) ভীত-সন্ত্রস্ত, পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের এই পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া দুঃসাধ্য।

(vi) মৌখিক পরীক্ষা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ।

১০.৪.২ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ঃ

বিষয়গত পাঠ গ্রহণের পর শিক্ষার্থী সেই বিষয়ে কতখানি সামর্থ্য অর্জন করেছে অর্থাৎ জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য কতটা অর্জন করেছে জানার জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নভিত্তিক লিখিত উত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়নের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাকেই বলা হয় লিখিত পরীক্ষা। সাধারণত তাত্ত্বিক বিষয়ের উপরেই লিখিত মূল্যায়ন করা হয়।

লিখিত পরীক্ষায় চার ধরণের প্রশ্ন ব্যবহারের রীতি চলে আসছে, তা হল সংক্ষিপ্ত, অতিসংক্ষিপ্ত, রচনাধর্মী এবং নৈর্ব্যক্তিক। নৈর্ব্যক্তিক ধরণের প্রশ্নের আবার নানান প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন সত্য-মিথ্যা নিরূপণ, সম্পূর্ণকরণ, বহুর মধ্যে নির্বাচন ইত্যাদি।

লিখিত পরীক্ষার সুবিধা ঃ

(i) শিক্ষার্থীর বিষয়গত শিক্ষায় জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

(ii) শিক্ষার্থীর দুর্বলতার দিকটি শনাক্ত করা যায়।

(iii) লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল শিক্ষার্থীর শিখনে প্রেরণা জোগায়।

(iv) শিক্ষার্থীর লিখনশৈলী বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(v) শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি ও সৃজনীশক্তির বিকাশে সহায়তা করে।

(vi) শিক্ষণ ও শিখনের ফলাফল নিরূপণ করা যায়।

(vii) প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

অসুবিধা :

(i) পরীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(ii) ব্যক্তিসাপেক্ষ নীতির প্রভাবমুক্ত নয়।

(iii) লিখিত পরীক্ষায় পরিমাপের যথার্থতার অভাব দেখা যেতে পারে।

(iv) যারা লিখনে দুর্বল তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌখিক ও লিখিত উভয় পদ্ধতিতে মূল্যায়নের রীতির প্রচলন রয়েছে।

১০.৫ কার্যসম্পাদনমূলক মূল্যায়ন ঃ (Outcome Evaluation)

কার্যসম্পাদনমূলক মূল্যায়ন দু'ভাবে করা যায়। শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করিয়ে কার্যসমাপ্তির পর তার মূল্যায়ন করার পদ্ধতিকে কার্যসম্পাদনমূলক মূল্যায়ন বলা হয়।

আবার অন্যভাবে 'অ্যাসাইনড টেস্টের' মতো শিক্ষার্থীকে কিছু প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে বলা হয়। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইসহ সাহায্যকারী পুস্তক-পুস্তিকা বা পত্রপত্রিকার সাহায্য নিয়ে সেই উত্তরপত্র তৈরি করে থাকে। অথবা নির্মিতি অধ্যায়ের অন্তর্গত

ভাবসম্প্রসারণ বা রচনা লিখে আনতে বলা হলে সেই লেখার মাধ্যমে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠনে তার উন্নতি কতটা ঘটেছে তার পরিমাপক পদ্ধতিকেও কার্যসম্পাদনমূলক মূল্যায়ন নামে অভিহিত করা হয়।

নির্ধারিত সময়ের অন্তরে গৃহীত/অনুষ্ঠিত কার্য সম্পাদনমূলক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী যতটুকু লিখতে পেরেছে বা কাজ করতে পেরেছে তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা। শিক্ষার্থীর শিখনের খুঁটিনাটি বিষয় এ ধরণের মূল্যায়নে যাচাই করা হয় না। তবে তার ধারণার সামগ্রিক মূল্যায়ন এভাবে সম্ভব।

১০.৬ অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যায়ন ঃ (Internal and External Evaluation)

১০.৬.১ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ঃ

অভ্যন্তরীণ শব্দটির অর্থ 'অন্তর' বা 'ভিতর'। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন বলতে বোঝায় বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের পরিসরের মধ্যে সারা বছর ধরে যে একক, মৌখিক, পার্বিক, ত্রৈপার্বিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক মূল্যায়ন হয় তাকেই। পাঠদানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিরাই এই মূল্যায়ন করে থাকেন। এগুলিকে শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন সংক্রান্ত মূল্যায়নও বলা হয়। এই মূল্যায়ন গঠনগত (Formative) মূল্যায়নের অংশ বিশেষ। বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ প্রাথমিক স্তরে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্তরের বিকাশ সম্পর্কীয় তথ্য শ্রেণি শিক্ষকেরা দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারেন। সদা সর্বদা এঁরা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর দৃক্‌পাত করেন। শিক্ষার্থী সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্য এঁদের নখদর্পণে। শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা সম্পর্কিত তথ্য নির্দিষ্ট করার পক্ষে শিক্ষকেরাই উপযুক্ত ব্যক্তি, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের সাহায্যে তাঁরা দুর্বলতাকে দূর করে অগ্রগতির পক্ষে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের সুবিধা ঃ

(i) চাপমুক্ত মনে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

(ii) অহেতুক ভীতির কোনো স্থান নেই।

(iii) পরিচিত পরিবেশে পরীক্ষা সংগঠিত হয় বলে শিক্ষার্থীরা ভারমুক্ত মনে মূল্যায়নের সম্মুখীন হয়।

অসুবিধা ঃ

(i) প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না।

(ii) পক্ষপাতিত্বের সুযোগ রয়েছে।

(iii) শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

১০.৬.২ বহির্মূল্যায়ন ঃ

যখন মূল্যায়নে শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরীক্ষার সংস্থা পৃথকভাবে অবস্থান করে তখন সেই সংস্থার দ্বারা পরিচালিত মূল্যায়নকে বলে বহির্মূল্যায়ন। অনেকে আবার শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাঁটা-চলা, কথাবার্তা বলা প্রভৃতির মূল্যায়নকে বহির্মূল্যায়ন বলে অভিহিত করেন। বোধ হয় দ্বিতীয় ধারণাটা ঠিক নয়।

প্রাথমিক শিক্ষার চতুর্থ শ্রেণির অন্তে যে পরীক্ষা বা বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয, তা বহির্মূল্যায়নের অন্তর্গত। বর্তমানে মেধা নির্ণয় ও সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বহু বাইরের সংস্থা নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করে, তাকেও বর্হির্মূল্যায়ন বলে।

বহির্মূল্যায়নের সুবিধা

(i) প্রকৃত মূল্যায়নের প্রকাশ ঘটে।

(ii) শিক্ষার্থীরা বাইরের পরিবেশে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করে।

(iii) একঘেয়েমি দূর হয়।

(iv) স্বজন-পোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

অসুবিধা ঃ

(i) সব শিক্ষার্থী নিজেকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

(ii) দুর্বল শিক্ষার্থীরা ভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

(iii) ব্যয়বহুল।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

- শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়নের গুরুত্ব কোথায়?
- নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন কাকে বলে?
- মৌখিক পরীক্ষার দুটি সুবিধা লিখুন।
- কার্য সম্পাদনমূলক মূল্যায়ন বলতে কী বোঝেন?
- অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ত্রুটিগুলি লিখুন।

১০.৭ পারদর্শিতার অভীক্ষা ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ঃ (Achievement Test)

১০.৭.১ পারদর্শিতার অভীক্ষা ঃ

শিক্ষাগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে সব অভীক্ষার ব্যবহার বর্তমানে করা হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত অভীক্ষা হল পারদর্শিতার অভীক্ষা। পারদর্শিতা বলতে বোঝায় কোনো কিছু সম্পাদনের ক্ষমতা। দক্ষতা অর্জন দু'ভাবে হয়—যথাক্রমে জন্মগতভাবে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণের প্রভাবে ব্যক্তিজীবনে যে পরিবর্তন তা পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা করা হয়, তাকেই পারদর্শিতার অভীক্ষা বলে।

পারদর্শিতার অভীক্ষার প্রকারভেদ রয়েছে। যে সব পারদর্শিতার অভীক্ষায় বিশেষ শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে অগ্রগতিকে পরিমাপ করে একটিমাত্র সংখ্যামান দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেগুলিকে বলা হয় **সাধারণ পারদর্শিতার অভীক্ষা।**

যে সব পারদর্শিতার অভীক্ষায় বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে গাণিতিক কৌশলের প্রয়োগ ঘটিয়ে আদর্শায়িত করা হয়, তাদের বলা হয় **আদর্শায়িত অভীক্ষা**। এই পদ্ধতিতে সব কিছুই অর্থাৎ যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, প্রয়োগপদ্ধতি, প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের সংস্থান কাঠিন্যমান অনুসারী, তাৎপর্য নির্ণয়ের পদ্ধতি, মান নির্ণয়ের পদ্ধতি পূর্বনির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ এই পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত।

যে অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের দুর্বলতার দিকগুলি কেবল বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বা নির্ণয় করে তাকে বলা হয় **নির্ণায়ক অভীক্ষা**। এই অভীক্ষা দুর্বলতা নির্ণয়ের সাথে সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা রয়েছে তা-ও নির্ণয় করে।

বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপের জন্য সামগ্রিক পারদর্শিতার অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের উপযুক্ত পারদর্শিতার অভীক্ষা আদর্শায়িত করতে হলে তার গঠনের সময় শিক্ষককে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত পর্যায় মেনে অগ্রসর হতে হবে—

- **কার্যকরী ধারণা গঠন ঃ** যে বিষয়ের অভীক্ষা গঠন করতে হবে সেই শ্রেণিতে সেই বিষয়ের পারদর্শিতা বলতে কী বোঝায় তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে। অর্থাৎ যদি চতুর্থ শ্রেণির বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের উপর পারদর্শিতার অভীক্ষা নির্মাণ করতে যাওয়া হয়, তাহলে সেই শ্রেণিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পারদর্শিতা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে একটি কার্যকরী ধারণা থাকা দরকার। আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের এই পর্যায়কে বলা হয় কার্যকরী ধারণা গঠনের স্তর।
- **বিনির্দেশক সারণী (Table of Specification) প্রস্তুতি ঃ** এই স্তরে শিক্ষার্থীর কাম্য শিখন সামর্থ্য চিহ্নিত করা হয়।
- **অভীক্ষাপদ সংগ্রহ ঃ** পরবর্তী পর্যায় কাজ হল অভীক্ষাপদের জন্য প্রশ্ন সংগ্রহ করা। শিক্ষার্থীরা তাদের পারদর্শিতা যে

জাতীয় আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবে, যে সকল আচরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম- এমন উদ্দীপক প্রশ্ন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই অভীক্ষাপদ সংগ্রহের সময় শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা ও শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

- **অভীক্ষাপদের বিচারকরণ ঃ** পূর্ববর্তী পর্যায়ে সংগৃহীত প্রশ্নগুলি যথাযথ কিনা তা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে যাচাইকরণ, যে কারণে এই স্তরকে বিচারকরণ স্তর বলা হয়।
- **নমুনা অভীক্ষা গঠন ঃ** অভীক্ষাপদ সংগ্রহ করাব পর সেগুলিকে যথাযথ শ্রেণিকরণ করা। যেমন—এক ধরনের প্রশ্নগুলিকে (সংক্ষিপ্ত, অতি-সংক্ষিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক, রচনাধর্মী) একসঙ্গে রাখার পরিকল্পনা কিংবা সমজাতীয় প্রশ্নগুলিকে কাঠিন্যমান অনুযায়ী সাজানো।
- **নমুনা অভীক্ষাপত্রের নির্দেশপত্র ও সময় নির্ধারণ ঃ** অভীক্ষাপত্রের জন্য যথাযথ নির্দেশনামা এবং সময়সীমা নির্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার।
- **নমুনা অভীক্ষার প্রয়োগ ঃ** অভীক্ষাটি যে শ্রেণির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই শ্রেণির একদল বাছাই করা ছাত্রের উপর তার প্রয়োগ ঘটিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করা প্রয়োজন। যাচাইয়ের পর উত্তরপত্রের মান নির্ণয় করতে হবে।
- **অভীক্ষাপদ বিশ্লেষণ ঃ** অভীক্ষা প্রয়োগের পর প্রাপ্ত মানগুলিকে বিশেষ গাণিতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার কৌশলকে বলা হয় অভীক্ষাপদ বিশ্লেষণ। প্রশ্নাবলীর অভ্যন্তরীণ সংগঠন ঠিক আছে কিনা, তা জানার জন্য অভীক্ষাপদ বিশ্লেষণ অপরিহার্য।
- **অভীক্ষার সর্বশেষ রূপদান ঃ** অভীক্ষাপদ বিশ্লেষণের পর গ্রহণযোগ্য প্রশ্নগুলিকে কাঠিন্যমান অনুযায়ী সাজানো এবং চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণের কাজ এই পর্যায়ে সংগঠিত হয়।
- **অভীক্ষার চূড়ান্ত প্রয়োগ ঃ** বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপর অভীক্ষাটির প্রয়োগ।
- **অভীক্ষার যথার্থতা নির্ণয় ঃ** নবগঠিত অভীক্ষার ফলাফলকে পুরাতন অভীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে অভীক্ষার যথার্থতা নির্ধারণ।
- **মান নির্ণয় পত্র ঃ** যেখানে অভীক্ষার মান নিরূপণ নির্দেশ থাকে। এই নির্দেশপত্র অভীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে ব্যক্তিগত প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।
- **তাৎপর্য নির্ণয়ের মান ঃ** সর্বশেষ পর্যায়ে অভীক্ষা প্রয়োগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সাধারণ মান নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যাতে পরবর্তীকালের শিক্ষকেরা তাঁদের প্রাপ্ত ফলাফলকে এই সাধারণ মানের ভিত্তিতে বিচার করতে পারেন।

অভীক্ষাপত্রের গুরুত্ব :

শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মাত্রা পরিমাপে অভীক্ষাপত্রের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন—

(i) শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপে সহায়তা করে।
(ii) শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করা যায়।
(iii) শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষক পাঠ পরিচালনার সুযোগ পান।
(iv) শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ন সম্ভব হয়।
(v) শিক্ষার্থীদের সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা করতে পারা যায়।
(vi) পারদর্শিতার অভীক্ষা পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠে অনুপ্রাণিত করে।
(vii) সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের মূল্যায়নে সহায়তা করে।
(viii) বিদ্যালয়ে ভরতির ক্ষেত্রে পারদর্শিতার অভীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০.৭.২ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

বর্তমানে শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ তাদের চাহিদা, আগ্রহ, সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখে

শিক্ষার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এবং বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হল শিক্ষকের কাজ। এইজন্য বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ব্যাপারটি সম্বন্ধে শিক্ষকের স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে শ্রেণিকরণ ব্যাপারটির আমদানি ঘটিয়ে বেঞ্জামিন ব্লুম (Benjamin Bloom) ও তাঁর সহযোগী বন্ধুরা, Krawthwal এবং Harrow, শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন এবং শিক্ষণের উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

মনোবিজ্ঞানী Bloom ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে Task analysis নামে একটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছিলেন যা বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছে। Bloom প্রস্তুত করেন Taxonomy। Taxonomy শব্দটি গ্রিক Taxis এবং Nomas থেকে এসেছে। যাদের অর্থ বিন্যাস করা, বা আইন, নিয়ম বা সূত্র। Bloom প্রথমে জ্ঞানমূলক মাত্রা (Cognitive Domain) শ্রেণিকরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সহযোগী Krawthwal ১৯৬৪ সালে প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্র (Affective Domain) এবং ১৯৭২ সালে Harrow মানসঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র (Psychomotor domain) যোগ করেন। সমগ্র পদ্ধতিটি পরে Bloom Taxonomy অর্থাৎ CAP নামে পরিচিত হয়। এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের রীতি চালু হয়।

আমরা প্রত্যেকেই জানি Bloom এর Taxonomy চারটি মূলস্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তম্ভ বা ভিত্তিগুলি হল—

(i) শিক্ষাগত ভিত্তি (Educational Base)—এটি শিক্ষারই ভিত্তি।

(ii) যুক্তিগত ভিত্তি (Logical Base)—যুক্তির ভিত্তিতে উদ্দেশ্যসমূহের শ্রেণিকরণে এর ভূমিকা।

(iii) মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (Psychogical Base)—শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য অনুসারে উদ্দেশ্যগুলির বিন্যাসসাধন।

(iv) কিউম্যুলেটিভ ভিত্তি (Cumulative Base)—ক্ষমতার ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী উদ্দেশ্যসমূহের বিন্যাসসাধন। যেমন জ্ঞানমূলক (Cognitive), বোধমূলক (Compretensive), প্রয়োগমূলক (Application)।

উপরিউক্ত ভিত্তিগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে CAP-এর শ্রেণি বিন্যাস হয়েছে এভাবে

(CAP Classification of Educational Objective)

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (Cognitive domain)	প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্র (Affective domain)	মনঃসঞ্চালমূলক ক্ষেত্র (Psychomotor domain)
মূল্যায়ন (Evaluation)	গ্রহণ (Receiving)	অনুকরণ (Imitation)
সংশ্লেষণ (Synthesis)	প্রক্রিয়াকরণ (Responding)	প্রয়োজনমাফিক ক্রিয়াকরণ (Manipulation)
বিশ্লেষণ (Analysis)	মূল্যবোধকরণ (Valueing)	নিখুঁতায়ন (Precision)
প্রয়োগ (Application)	সংগঠন (Organisation)	পরিস্ফুটন (Articulation)
বোধ (Comprehension/ Understanding)	চরিত্রায়ন Characteristion)	স্বাভাবিকীকরণ (Naturalisation)
জ্ঞান (Knowledge)		

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সময় এই কথাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে আমরা কতকগুলি পর্যায় চিহ্নিত করে অগ্রসর হই।

(ক) **প্রথম পর্যায় ঃ** সমগ্র পাঠ্যাংশটিকে কতকগুলি উপএককে ভাগ করে নিতে হবে। পাঠ্য বিষয়বস্তু বা পাঠ্যাংশ বড়ো হলে সেটি একটি পিরিয়ডে আলোচনা করা সম্ভব নয়। পিরিয়ডের সময় অনুযায়ী উপএকক ভাগের নিয়মবিধিকে মনে রেখে কয়েকটি উপএককে বিষয়বস্তুটিকে তাই ভাগ করতে হয়। এই উপএককে ভাগের বিষয়টি আবার বার্ষিক কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বিন্যাস করা দরকার। ছোটো কবিতা বা গদ্য, নিম্ন প্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে উপএককে ভাগের প্রয়োজন হয় না।

(খ) **দ্বিতীয় পর্যায় ঃ** বিভাজিত উপএককগুলির প্রথমটিকে আলোচনার জন্য আনা এবং সংশ্লিষ্ট উপএককের মুখ্যবস্তুকে চিহ্নিত করা।

(গ) **তৃতীয় পর্যায় ঃ** শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য পূর্বার্জিত জ্ঞানের পরিসর যাচাই করে পাঠ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার মেলবন্ধন ঘটানো।

(ঘ) **চতুর্থ পর্যায় ঃ** এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে উপএককের/ এককের জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক, দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যগুলি তাদের সামনে তুলে ধরে তাদের জিজ্ঞাসা এবং বিকাশ প্রক্রিয়াকে চরিতার্থ করাই হল আমাদের কাজ।

(ঙ) **পঞ্চম পর্যায় ঃ** বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠদান, অনুবন্ধ পদ্ধতির ব্যবহার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ তৈরি করা, কৃষ্ণফলকের ব্যবহার করা, সহায়ক উপকরণের ব্যবহার, কর্মপত্র নিয়ে আলোচনা এবং সবশেষে মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা।

বিষয় - বাংলা **একক অভীক্ষাপত্র রচনার পরিকল্পনা** **ব্লু-প্রিন্টের খসড়া পত্র**

শ্রেণি -পঞ্চম **একক - বোকা কুমিরের উপকথা** **পূর্ণমান - ২০**

—উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী **সময় - ৩০ মিনিট**

উপএকক	উদ্দেশ্য অনুযায়ী নম্বর বিভাজন				মোট	প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী নম্বর বিভাজন			
	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	নম্বর	নৈর্ব্যক্তিক	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	দীর্ঘ/রচনা
লেখক পরিচিতি ও উৎস	১	—	—	—	১	০+১+০+০	—	—	—
সরব, নীরব পাঠ ও সামগ্রিক অর্থবোধ	২	১	—	—	৩	—	০+১+০+০	২+০+০+০	—
পাঠের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা, শব্দার্থ	২	৫	২	—	৯	১+০+০+০	১+০+২+০	—	০+৫+০+০
মর্মবস্তু	—	৩	—	—	৩	০+১+০+০	—	০+২+০+০	—
ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত	—	২	১	—	৩	০+০+১+০	—	০+২+০+০	—
শ্রুত লিখন ও হাতের লেখা	—	—	—	১	১	—	০+০+১+১	—	—
মোট	৪	১২	৩	১	২০	৪(৪)	৫(৫)	৬(৩)	৫(১)
শতকরা	২০	৬০	১৫	৫	১০০	২০	২৫	৩০	২০

	প্রশ্নসংখ্যা	মূল্যায়ন মান
নৈর্ব্যক্তিক -	৪	৪
অতি সংক্ষিপ্ত	৫	৫
সংক্ষিপ্ত	৩	৬
দীর্ঘ/রচনা	১	৫

* বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যাটি প্রশ্নসূচক

* বন্ধনীর বাইরের সংখ্যাটি মূল্যমানসূচক

১০.৯ দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র তৈরি এবং এককভিত্তিক নমুনা প্রশ্নপত্র সৃজন

একক **পূর্ণমান-২০**

বিষয় : বাংলা **সময়-৩০ মিনিট**

শ্রেণি : পঞ্চম

১. **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) চাষ করতে গেল—
কুমির আর শেয়াল/গরু আর কুকুর/ছাগল আর মোষ (জ্ঞান)

(খ) এবার বড্ড ঠকে গেছি। বলেছিল (জ্ঞান)
কুমির/শেয়াল/বাঘ।

(গ) 'বোকা কুমিরের কথা' গল্পটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? (জ্ঞান)
সেকালের কথা/টুনটুনির বই/ছেলেদের রামায়ণ।

(ঘ) কুমির ও আর শিয়াল মিলে কি করত– (জ্ঞান)
চুরি/চাষ/চাকরি

২. **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) গল্পে কারা চাষ করতে গেল? (জ্ঞান)

(খ) গল্পে কে চালাক ছিল? (বোধ)

(গ) 'লাভ' শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ। (জ্ঞান)

(ঘ) একটি উভচর প্রাণীর নাম বলো। (জ্ঞান)

(ঙ) আলু চাষের পর কী চাষ হয়েছিল? (জ্ঞান)

৩. **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) কিসের কিসের চাষ তারা করেছিল? (জ্ঞান)

(খ) চাষ করে কার লাভ এবং কার ক্ষতি হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়? (বোধ)

(গ) শিয়ালকে ঠকাতে আখ চাষের সময় কুমির কী ফন্দি এঁটেছিল? (বোধ)

৪. **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) বোকা কুমিরের গল্পটির মূলভাববস্তু নিজের ভাষায় লেখ। (বোধ)

পারদর্শিতামূলক অভীক্ষাপত্রের খসড়া

ধরণ	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	মোট নম্বর শতকরা	আনুপাতিক হার (%)
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	১-এর ক, খ, গ (১)				৩	১৫%
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	২-এর ক (২)				২	১০%
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন		৩-এর ক (৫)				৫ ২৫%
রচনাত্মক প্রশ্ন				৪-এর ক (১০)	১০	৫০%
মোট নম্বর/শতকরা	৫	৫	০	১০	২০	১০০%
আনুপাতিক হার	২৫%	২৫%	—	৫০%	১০০%	—

* বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নের সংখ্যা এবং বন্ধনীর ভিতরে প্রশ্নের মূল্যমান

একক অভীক্ষাপত্র

শ্রেণী- চতুর্থ

বিষয় - বাংলা **পূর্ণমান - ২০**

একক - ছেলেবেলার দিনগুলি **সময় - ৩০ মিনিট**

— পূণ্যলতা চক্রবর্তী

১. **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) মা সুন্দর করে কত তলার পুতুলঘর সাজিয়ে দিয়েছিল—এক/দুই/তিন/চার। (জ্ঞান)

(খ) হাতকড়ি পাকায়—চোর/পুলিশ/শিক্ষক/উকিল। (জ্ঞান)

(গ) হ য় ব র ল হল একটি—খেলনা/ট্রেন/গাছ/বই। (জ্ঞান)

২. **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) গঙ্গামাটি কোথা থেকে জোগাড় করেছিল? (জ্ঞান)

(খ) গঙ্গামাটি দিয়ে কী করা শুরু হল? (জ্ঞান)

৩. **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) 'রাগ বানানো' খেলাটা কীভাবে খেলতে হত? (বোধ)

৪. **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) 'তোমাকে দেখছি এবার লোহার বালা গড়িয়ে দিতে হবে।'—এ কথা কে বলেছিল? (জ্ঞান)

কোন্ প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তি? (বোধ)

বক্তাকে তোমার কেমন মনে হয়েছে? (দক্ষতা)

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন ঃ

- পারদর্শিতার অভীক্ষা কী?
- আদর্শায়িত অভীক্ষা কাকে বলে?
- বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়?
- CAP-এর সম্পূর্ণ রূপটি লিখুন।

১০.১০ ● সারসংক্ষেপ ঃ শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মূল্যায়ন। পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হল মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশকে ফলপ্রসূ করার জন্য পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রচলন। বিদ্যালয়ে নানানভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে থাকি। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নবতর সংযোজন হল নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক মূল্যায়ন। এছাড়া শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে পারদর্শিতার অভীক্ষা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে গুরুত্ব লাভ করেছে। এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এর দ্বারা উপকৃত হয়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে আরও বিশ্বাসযোগ্য ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেঞ্জামিন ব্লুমের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ

(ক) শিক্ষা প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল

(i) পদ্ধতি (ii) শিক্ষার্থী (iii) মূল্যায়ন (iv) সবগুলি।

(খ) বেঞ্জামিন ব্লুম হলেন

(i) সাহিত্যিক (ii) দার্শনিক (iii) মনোবিজ্ঞানী (iv) রসায়নবিদ।

(গ) মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন

(i) প্রাচীনকালে (ii) মধ্যযুগে (iii) বর্তমান কালে (iv) সবকালে।

২. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) মূল্যায়ন কী?

(খ) সামগ্রিক মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়?

(গ) লিখিত পরীক্ষার দুটি সুবিধা লিখুন।

(ঘ) অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন কাকে বলে?

(ঙ) বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়?

৩. রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) মূল্যায়নের উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে আপনার ধারণা বিবৃত করুন।

(খ) পরীক্ষা ও মূল্যায়নের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

(গ) বহির্মূল্যায়নের সুবিধা-অসুবিধা লিখুন।

(ঘ) পারদর্শিতার অভীক্ষার ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ কেন?

(ঙ) কার্য সম্পাদনমূলক মূল্যায়নের যৌক্তিকতা বিচার করুন।